ইমামিয়্যাহ্ শীয়াদের আকিদা- বিশ্বাস

(সংক্ষিপ্ত)

মূলঃ আয়াতুল্লাহ্ আল উযমা মাকারেম শিরাযী

অনুবাদঃ মাওঃ মোঃ আবু সাঈদ

প্রকাশনায়ঃ দাওয়াতী মিশন

ইমামিয়্যাহ্ শীয়াদের আকিদা- বিশ্বাস

মূলঃ আয়াতুল্লাহ্ আল উযমা মাকারেম শিরাযী

অনুবাদঃ মাওঃ মোঃ আবু সাঈদ

সংশোধনঃ মরহুম মাওঃ আলী আক্কাস ।

সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ মতিউর রহমান ।

প্রকাশনায়ঃ দাওয়াতী মিশন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

এই বইয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

এক : আমরা এ যুগে বিরাট একটি বিল্পব প্রত্যক্ষ করলাম যা খোদায়ী দ্বীনসমূহের অন্যতম দ্বীন ইসলামের বিল্পব।

ইসলাম আমাদের যুগে এসে আরেকবার নব- জীবন লাভ করল। বিশ্ব মুসলিম নিদ্রা থেকে জেগে উঠল এবং নিজেদের আসল জায়গায় ফিরে এল। আর নিজেদের যে সব সমস্যাবলীর সমাধান কোথাও খুঁজে পাচ্ছিল না তা ইসলামের শিক্ষা- সংস্কৃতি ও মৌলিক শাখা- প্রশাখাগত বিধি- বিধানগুলোর মাঝে সন্ধান করতে লাগল।

এ বিল্পব সফল হওয়ার কারণ কী? সে বিষয়ে আলোচনা একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। সব চেয়ে বড় কথা হল, আমাদের জানি এ মহান বিল্পবের প্রভাব সমস্ত ইসলামী দেশসমূহে এমনকি ইসলামী বিশ্বের বাইরের দেশগুলোতেও সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাইতো দুনিয়ার অনেক মানুষ আজ ইসলামকে জানতে চায়। অবগত হতে চায় বিশ্ব মানবতার জন্যে ইসলামের নতুন আহ্বান সম্পর্কে।

এমন একটি স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কর্তব্য হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত যে পরিচয় রয়েছে তা কোন প্রকার অঙ্গসজ্জা ব্যতিরেকে এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ মানুষের সামনে তাদের বোধগম্য করে তুলে ধরা। আর মানুষের মধ্যে ইসলাম ও ইসলামী মাযহাবসমূহ সম্পর্কে জানার জন্য যে আগ্রহ ও পিপাসা রয়েছে যথাযথ বর্ণনার মাধ্যমে তা নিবারণ করা। আর আমাদের স্থলে অন্যদেরকে ইসলাম সম্পর্কে কথা বলার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ না দেয়া।

দুই : অস্বীকার করার জো নেই যে, অন্যান্য মতবাদের ন্যায় ইসলামেও বিভিন্ন মাযহাব ও ফিরকামত বিদ্যমান, যার প্রত্যেকটিরই আকীদা- বিশ্বাস ও আমল- অনুশীলনের ক্ষেত্রে নিজস্ব আলাদা- আলাদা বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। কিন্তু এ ভিন্নতা ও পার্থক্য কখনই এমন পর্যায়ের নয় যে,

একই ইসলাম বিশ্বাসীদের মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বরং তারা নিজেরা পরস্পরের সাহায্য- সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সৃষ্ট যে কোন ঝড়- তুফানের মুকাবিলায় নিজেদেরকে রক্ষা করতে এবং নিজেদের অভিন্ন শত্রুদেরকে তাদের নীল- নকশা বাস্তবায়নের পথে বাধা দিতে সক্ষম ।

নিঃসন্দেহে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি ও তা দৃঢ় ও গভীর করার জন্যে কিছু মূলনীতি ও নীতিমালা মেনে চলা প্রয়োজন। এর মধ্যে সর্বাধিক গু পূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে ইসলামী ফিরকা- মতসমূহ পরস্পরকে ভালভাবে জানতে হবে। এক ফিরকার নীতি ও বৈশিষ্ট্যাবলী অন্য ফিরকার লোকদের সামনে স্পষ্ট ও পরিস্কার থাকতে হবে। কেননা পরস্পরের চেনা- জানাই হচ্ছে একমাত্র হাতিয়ার যা ভুল বুঝা- বুঝি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে ও পরস্পরের সহযোগিতার পথ সহজ করে দিতে পারে।

পরস্পরকে চেনা- জানার সবচেয়ে উ ম উপায় হচ্ছে প্রত্যেক মাযহাবের আকীদা- বিশ্বাসের বিষয়গুলো এবং তাদের মৌলিক ও শাখা- প্রশাখাগত ব্যাপারগুলো সে মাযহাবেরই বড় বড় বি - পন্ডিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে অবগত হওয়া। কেননা, যদি অজানা- অ দের কাছ থেকে জানতে চাই অথবা কোন মাযহাবের আকীদা- বিশ্বাসের বিষয়গুলো তাদের শত্রুদের কাছ থেকে শুনতে চাই তাহলে ভালবাসা ও বিদ্বেষ আমাদের লক্ষ্য- উদ্দেশ্যে পৌঁছার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে এবং আমাদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তখন সহযোগিতার বিষয়টি নিরাশার রূপ পরিগ্রহ করবে।

তিন : উপরোল্লেখিত দু'টি দৃষ্টি- ভঙ্গির প্রেক্ষিতে শিয়া ইমামিয়া মাযহাবের মৌলিক বিশ্বাস ও শাখা- প্রশাখাগত বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরাই হচ্ছে এ ছোট্ট পুস্তকটি রচনার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, যা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যাবলী সমৃদ্ধ :

১. প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়গুলোর সার- সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাতে পাঠকবৃন্দ বহু সংখ্যক বই- পুস্তক অধ্যয়ন করা থেকে নিস্কৃতি লাভ করবে।

২. আলোচনা স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক মুক্ত। এমনকি সে সব পরিভাষাগুলোকেও পরিহার করা হয়েছে, যেগুলো শুধু দ্বীনি মাদ্রাসার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তবে পাঠক মহলের গভীর ও সুক্ষ্ম অধ্যায়নের অন্তরায় নয়।

৩. যদিও আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু আকীদা- বিশ্বাসের বিষয় নিয়ে, এবং তার দলীল-প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; তবে স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে মনের তাগিদে সাড়া দিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে যতটুকু সম্ভব কোরআন, হাদীস ও বিবেক ভি ক দলীল সমৃদ্ধ আলোচনা করেছি।

৪. সব ধরনের গোপনীয়তা, প্রতারণা ও অযৌক্তিক পূর্ব ধারণার নীতি পরিহার করা হয়েছে, যাতে করে বিষয়গুলো বাস্তবে যা আছে তারই রূপায়ণ ঘটে।

৫. অন্যান্য মাযহাবসমূহের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

এ ছোট্ট পুস্তিকাটি পূর্বোল্লেখিত ৩ টি বিষয়কে সামনে রেখে বাইতুল্লাহ্ শরীফের হজ্বব্রত পালনের সফরকালে, যখন অন্তরাত্মা অধিক স্বচ্ছতা সমৃদ্ধ থাকে, তখন রচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে কয়েকটি বৈঠকে একদল বি আলেমের উপস্থিতিতে বিষয়টির উপর আলোচনা- পর্যালোচনার পর সমাপ্তির পর্যায়ে উপনিত করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস যে, আমরা আমাদের উদ্দেশ্যের পর্যায়ে সফলতার স্তরে পৌঁছতে পেরেছি, যে উদ্দেশ্যের কথা ইতিমধ্যেই আমরা প্রকাশ করেছি। আর এর প্রতিদান শেষ বিচার দিনের জন্য জমা করে রাখার আবেদন মহান আল্লাহর দরবারে রাখলাম। আরএ জগতে আমাদের প্রার্থনা হচ্ছে :

(رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ)

“হে আমাদের প্রভূ! আমরা একজন আহ্বানকারীর (রাসূলুল্লাহ্ সঃ) এর (আহ্বান) শুনেছি, তিনি আমাদেরকে ঈমান আনয়নের জন্যে আহ্বান জানাচ্ছেন যে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! অতএব, আমাদের পাপ ও

অন্যায়গুলোকে ক্ষমা এবং আমাদের ভুল- ত্রুটিগুলো আমাদের থেকে মোচন করে দাও। আর আমাদের মৃত্যু নেক্কার লোকদের সাথে কর" (সূরাঃ আলে ইমরান, আয়াত নং ১৯৩)।

নাছের মাকারিম শিরাযী

মাদ্রাসাতুল ইমাম আমী ল মু' মিনীন (আঃ), কোম, ইরান

মুহাররামুল হারাম ১৪১৭ হিঃ

প্রথম অধ্যায়

খোদা পরিচিতি ও একত্ববাদ

১মহান আল্লাহর অস্তিত্ব. :

আমরা বিশ্বাস করি : মহান আল্লাহ্ই সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা। তাঁর শ্রেষ্ঠ , বি তা ও শক্তি- ক্ষমতার নিদর্শনাবলী পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টির সৃষ্টি নৈপুণ্যের অবয়বে স্বতঃপ্রমাণিত। আমাদের নিজেদের অস্তি র নিপুণতার মাঝে, প্রাণী জগৎ ও উদ্ভিদ জগতের রকমারি , আকাশ মন্ডলের গ্রহ- নক্ষত্রগুলোর মধ্যে ও সৌরজগতের সর্বত্রই তাঁরই শক্তি- ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।

আমরা বিশ্বাস করি : এ পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে যত অধিক পরিমাণ চিন্তা গবেষণা করব ততোধিক পরিমাণে খোদার বি তা ও শক্তি- সামর্থ্য সম্পর্কে অবগত হব। এভাবে আমাদের অবগতি বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন আমাদের জন্যে আল্লাহর অশেষ বি তা সম্পর্কে জানার নতুন নতুন দরজা খুলে যাবে এবং আমাদের চিন্তা- গবেষণার ক্ষেত্রগুলোকে আরো ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ও বৃদ্ধি করবে। আর চিন্তা- ভাবনার এ ধারা আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালবাসার উৎসগুলোকে উ র উ র আরো বাড়িয়ে দিবে এবং আমাদেরকে প্রতিটি মুহূর্তে সে মহান স ার সান্নিধ্যে ও নিকটে পৌছাতে সাহায্য করবে। আর তাঁর মহিমা ও সৌন্দর্যের মধ্যে আমাদেরকে একাকার ও বিলিন করে দেবে।

পবিত্র কোরআন বলছে :

(وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ)

“অর্থাৎ আর (খোদার প্রতি) আস্থাশীল লোকদের জন্য ভূ- পৃষ্ঠে যথেষ্ঠ নিদর্শনাদি বিদ্যমান রয়েছে। আর তোমাদের নিজেদের অস্তি র মধ্যেও (যে সব নিদর্শন রয়েছে) সেগুলো কি তোমরা প্রত্যক্ষ্য করছো না?” (সূরাঃ আযযারিয়াত, আয়াত নং ২০- ২১)।

মহান আল্লাহ বলেন :

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

"নিঃসন্দেহে আসমান ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে এবং পর্যায়ক্রমে রাত ও দিনের প্রত্যাগমনের মধ্যে চক্ষুষমান ানী লোকদের জন্য (সুস্পষ্ট) নিদর্শনাদি বিদ্যমান রয়েছে। তাদের অবস্থা হচ্ছে যে, তারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়ানো, বসা ও শয়ন অবস্থায়। আর তারা আসমান ও যমীনের সৃষ্টির (নিপুণতা ও রহস্যের) ব্যাপার নিয়ে গভীর চিন্তা- গবেষণা করে। (আর বলে) হে আমাদের প্রভূ! এ সবের কোনটিই তুমি অহেতুক বা অনর্থক সৃষ্টি করনি"। (সূরা: আলে ইমরান, আয়াত নং- ১৯০- ১৯১)

২. আল্লাহর মহত্ব ও সুন্দর বৈশিষ্ট্যাবলী :

আমরা বিশ্বাস করি : মহান আল্লাহ্ সর্ব প্রকার দোষ- ত্রুটি মুক্ত। তিনি পরিপূর্ণতার প্রতীক, তিনি নিরঙ্কুশ ও সামগ্রিক পরিপূর্ণ একস ।। অন্য কথায়, এ পৃথিবীতে যত সৌন্দর্য ও পূর্ণতা আছে সে সব কিছুরই কেন্দ্রীয় উৎস হচ্ছে তিনি এবং তাঁর থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি। মহান আল্লাহ্ বলেন :

(هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)

"তিনিই সে মহান আল্লাহ্ যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ (উপাস্য) নেই। তিনিই প্রকৃত মালিক ও অধিপতি। সর্ব প্রকারের দোষ- ত্রুটি মুক্ত। নিরাপওা প্রদানকারী। সব কিছুর সংরক্ষক ও নিয়ন্ত্রক। তিনি সেই অপরাজিত শক্তিধর- যিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী সব কিছু ঢেলে সাজান। (মুশরিকরা) যাদেরকে তাঁর সমকক্ষ ও অংশীদার হিসাবে দাঁড় করায়, তিনি সে সব থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি সেই মহান সৃষ্টিকর্তা- যিনি অনাদিকাল থেকে সৃষ্টি করে আসছেন। আকৃতি গঠণের মহা

চিত্রকর। সৌন্দর্যমন্ডিত উ ম নামসমূহ তাঁরই জন্যে নির্দিষ্ট। আকাশ- মন্ডল ও ভূ- মন্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর প্রশংসা- স্থতি পাঠ করছে। আর তিনি মহা পরাক্রমশালী ও প্র াময়"(সূরা : আল- হাশর, আয়াত নং ২৩- ২৪)।

উপরোল্লেখিত আল্লাহর মহিমা- মহ , শোভা- সৌন্দর্য ও গুণ- বৈশিষ্ট্যাবলী তাঁর একটা অংশ বিশেষ মাত্র।

৩. আল্লাহর সত্তা অনন্ত- অসীম :

আমরা বিশ্বাস করি : মহান আল্লাহ্ এমন এক স া যিনি সর্ব পর্যায় ও ক্ষেত্রেই অনন্ত- অসীম। বি তায়, শক্তি- ক্ষমতায়, অনাদিকাল থেকে অনন্ত কাল পর্যন্ত চিরজীবী থাকা ইত্যাদি সর্ব ক্ষেত্রে আল্লাহর জন্যে কোন প্রান্ত- সীমা নির্ধারণ করা যায় না। এ কারণেই স্থান- কাল- পাত্র কোন কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কেননা, স্থান- কাল- পাত্র এ সব কিছুরই একটা সীমা ও প্রান্ত আছে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান। কারণ, তিনি স্থান- কাল- পাত্র ইত্যাদির উর্ধে। মহান আল্লাহ্ বলেন :.

(وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ)

"তিনি সেই মহান স া যিনি আকাশ- মন্ডলে ও ভূ- মন্ডলে ইবাদতের যোগ্য। আর তিনিই অতি প্র াময় ও মহা ানী" (আয যুখরোফ : ৮৪)।

আল্লাহ্ আরো বলেন :.

(وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

"তিনি তোমাদের সাথেই আছেন যেখানেই থাকনা কেন। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম- কান্ড সব প্রত্যক্ষ করছেন"(সূরা : আল- হাদীদ, আয়াত নং ৪)।

এটা স্পষ্ট যে; তিনি আমাদের অন্তরের থেকেও আমাদের নিকটতম। তিনি আমাদের অন্তরাত্মায় বিরাজমান এবং সর্বত্রই তিনি বিদ্যমান। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর কোন নিদির্ষ্ট স্থান নেই। আল্লাহ্ বলেন :.

(وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)

"আর আমরা তার প্রধান শিরা (রগ) অপেক্ষাও নিকটতম" (ক্বাফ : ১৬)। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন : .

(هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)

"তিনি অনাদিকাল থেকে আছেন এবং অনন্ত ও চিরঞ্জীব। তিনি প্রকাশ্য ও গোপন। আর তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত" (আল- হাদীদ : ৩)।

এ কারণে আমরা কোরআনের অন্য একটি আয়াতে দেখতে পাই : ذو العرش المجيد অর্থাৎ তিনি মহান আরশের অধিকারী (অধিপতি) এবং শ্রেষ্ঠে র অধিকারী। (আরশ এর অর্থ এখানে কোন রাজ সিংহাসন নয়) অনুরূপ আরেকটি আয়াতেও দেখতে পাই : "দয়াময় মহান আল্লাহ্ আরশের উপর সমাসীন। কোরআনের কোন কোন আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহর সিংহাসন সমগ্র আসমান ও জমিন ব্যাপী। যেমন :

(وسع كرسيه السموات و الارض)

"তাঁর সিংহাসন সমগ্র আসমান ও জমিন ব্যাপী বিস্তৃত"। এর অর্থ কখনোই এটা নয় যে, মহান আল্লাহ্ বিশেষ কোন স্থানে অবস্থান করছেন। বরং সমগ্র সৃষ্টি জগৎ ও প্রাকৃতিক পরিমন্ডলে তাঁর সার্বিক সার্বভৌম কর্তৃে র কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। কেননা, যদি তাঁর জন্যে কোন স্থান নিদির্ষ্ট করি তাহলে তাঁকে সীমিত করে ফেললাম। আর সৃষ্টির গুণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে প্রমাণ করতঃ তাঁকে অন্যান্য বস্তুর মতই মনে করলাম। বস্তুতঃপক্ষে তিনি :অর্থাৎ কোন কিছুই তাঁর মত নয় (সূরা : আশ শুরা, আয়াত নং ১১)। অর্থাৎ তাঁর সমতুল্য আর কেউ নেই (সূরা : তাওহীদ, আয়াত নং ৪)।

৪. আল্লাহ্ নিরাকার ও কখনই দেখা যাবে না :

আমরা বিশ্বাস করি : বাহ্যিক চক্ষু দিয়ে কখনো আল্লাহকে দেখা যাবে না। কেননা চক্ষু দিয়ে আল্লাহকে দেখার অর্থ হচ্ছে- তাঁর দেহ ও আকৃতি নির্দিষ্ঠ স্থান ও জায়গা, রং ও শরীর থাকা এবং তিনি কোন দিক বা কোন মুখী থাকা । আর এগুলো সবই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ্ এসব কিছুর উর্দ্ধে।

অতএব আল্লাহকে দেখতে পাওয়ার বিশ্বাস এক প্রকারের শিরক। আল্লাহ্ বলেন :

(لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)

"চক্ষুগুলো তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারেনা কিন্তু তিনি সকল চক্ষুকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন। আর তিনি অতীব দয়ালু ও সর্ব " (আনআম : ১০৩)।

এ কারণেই বনী ইসরাঈলের বাহানা- অজুহাত সন্ধানী লোকেরা হযরত মুসার (আঃ) নিকট আল্লাহকে দেখার দাবী উত্থাপন করলে তিনি বলেন :

(لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً)

"আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রতি ঈমান আনবনা যতক্ষণ না আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে পাব" (সূরা : আল- বাকারাহ- ৫৫)।

অতঃপর মুসা (আঃ) তাদেরকে তুর পাহাড়ে নিয়ে গেলেন এবং তাদের দাবীর কথা আরেকবার আল্লাহর কাছে পেশ করলেন। তখন মহান আল্লার পক্ষ থেকে এই জবাব এলো :

(وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ)

অর্থাৎ আমাকে কক্ষনো দেখতে পাবে না, কিন্তু ঐ পাহাড়ের প্রতি তাকাও, যদি তা স্বস্থানে স্থীর থাকে তাহলে আমাকে দেখতে পাবে। অতঃপর তার প্রভূ যখন পাহাড়ের উপর স্বীয় জ্যোতি বিকাশ করলেন তখন তা চূর্ণ- বিচূর্ণ হয়ে ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল। আর মুসা (আঃ) সং াহীন হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন। অতঃপর আবার যখন ান ফিরে আসলো তখন নিবেদন করলেন পরওয়ারদিগার! তুমি পাক- পবিত্র। সেই মহাস া যাকে চক্ষু দিয়ে দেখা যায় না। আমি তোমার প্রতি প্র াবর্তন করলাম। আর আমি প্রথম মু'মিন। (সূরা আল আরাফ ১৪৩)।

উল্লেখিত ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, বাহ্যিক দৃষ্টির মাধ্যমে কখনো আল্লাহকে দেখা যাবে না।

আমরা বিশ্বাস করি : যদি কোন আয়াত অথবা কোন হাদীস আল্লাহকে দেখা যায় সম্পর্কে পরিলক্ষিত হয় তাহলে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তর চক্ষু ও অন্তর ান দ্বারা আল্লাহকে দেখা। কেননা, সব সময়ই কোরআনের আয়াতসমূহ পরস্পরের ব্যাখ্যা করে থাকে।

القرآن يفسر بعضه بعضا

অর্থাৎ কোরআনের আয়াতসমূহ পরস্পরের ব্যাখ্যা করে। বিখ্যাত এ হাদীসটি জনাব ইবনে আব্বাস (রহঃ) থেকে বর্ণিত। কিন্তু এ হাদীসটি নাহজুল বালাগাতে অন্যভাবে এসেছে : "আয়াতসমূহ পরস্পরের সাক্ষ্য দেয়, " (খোৎবা নং ১০৩)।

এ ছাড়া এক ব্যক্তি হযরত আলীকে (আঃ) জি াসা করলো :

"হে আমী ল মুমিনীন! আপনি কি কখনো আপনার প্রভূকে দেখতে পেরেছেন? তিনি বললেন: আমি কি এমন খোদার ইবাদত করি যাকে দেখতে পাইনা? অতঃপর আরো বলেন : বাহ্যিক চক্ষুগুলো কখনো প্রকাশ্যে তাঁকে দেখতে পায় না কিন্তু, অন্তরাত্মা ও ঈমানী শক্তি তাঁকে প্রত্যক্ষ্য করে, (নাহজুল বালাগাহ খোৎবা নং ১৭৯)।

আমরা বিশ্বাস করি : সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যাবলী আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করা, যেমন : আল্লাহ্ সমাসীন আছেন, আল্লাহ্ কোন প্রান্তমুখী আছেন, আল্লাহর দেহাবয়ব আছে, আল্লাহকে দেখা যায় এ জাতীয় আকীদা- বিশ্বাস আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় থেকে অনেক দূরে সরে যাওয়ারই নামান্তর এবং শিরকে লিপ্ত হওয়া ছাড়া কিছু নয়। হ্যাঁ; মহান আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টি ও সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যাবলী থেকে উর্দ্ধে এবং তাঁর সমতুল্য কোন বস্তুই হতে পারে না।

৫. একত্ববাদ সমস্ত ইসলামী শিক্ষার প্রাণ :

আমরা বিশ্বাস করি : মহান আল্লাহকে চেনা ও জানার সবচেয়ে গু পূর্ণ দিকটি হচ্ছে আল্লাহর এক বাদ ও তৌওহীদের বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া, বস্তুতঃপক্ষে তৌওহীদ কেবলমাত্র একটা উছূলে দ্বীন বা দ্বীনের একটি মৌলিক বিষয় নয় বরং ইসলামী আকীদা- বিশ্বাসের মূল ও কেন্দ্রীয় বিষয়।

এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে বলা যায় : ইসলামের মৌলিক ও শাখা- প্রশাখাগত সমস্ত বিধি- বিধান তৌওহীদ বা এক বাদের ভি তেই গড়ে উঠবে। স াগত এক বাদ, বৈশিষ্টগত এক বাদ ও ক্রিয়াগত এক বাদ অর্থাৎ সর্ব ক্ষেত্রেই এক বাদের রূপরেখা থাকতে হবে। অন্য এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী নবী- রাসূলগণের দাওয়াতের এক বাদ, আল্লাহর দ্বীন ও বিধি- বিধানের এক বাদ,

কিবলা ও আসমানী কিতাবের এক বাদ, সমগ্র মানব জাতি সম্পর্কীত খোদায়ী আইন- কানুন ও বিধি- বিধানের এক বাদ, মুসলমানদের দলমতগুলোর এক বাদ ও বিচার দিনের এক বাদ। এ কারণেই কোরআন মজীদ আল্লাহর এক বাদের বিচ্যুতি ও শিরক প্রবণতাকে ক্ষমাহীন অপরাধ (গুনাহ্) বলে ঘোষণা করছে। আল্লাহ্ বলেন :

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا)

"আল্লাহ্ কখনো শিরক জনিত অপরাধ ক্ষমা করবেন না। আর এ ছাড়া (এর চেয়ে নিম্নের) অন্যান্য সব অপরাধ, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কাউকে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল সে তো মহা পাপে পাপী হল। (সূরা : আন নিসা, আয়াত নং ৪৮।)

আল্লাহ্ আরো বলেন :

(وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)

তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তী নবী- রাসূলদের প্রতি প্রত্যাদেশ (অহী) পাঠানো হয়েছিল যে, যদি শিরক জনিত অপরাধ কর তাহলে তোমার সমস্ত আমল- অনুশীলনই বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে যাবে। আর তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত বলে পরিগণিত হবে। (সূরা : যুমার, আয়াত নং ৬৫)

৬. একত্ববাদের শাখাসমূহ :

আমরা বিশ্বাস করি : এক বাদের অনেক শাখা রয়েছে তন্মধ্যে নিম্ন বর্ণিত চারটি শাখা অত্যন্ত গু পূর্ণঃ

(ক) স াগত বা সহজাত এক বাদ : অর্থাৎ মহান আল্লাহর স া এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সমতুল্য, সমকক্ষ ও সদৃশ কোন কিছুই নেই।

(খ) বৈশিষ্ট্যগত এক বাদ : অর্থাৎ আল্লাহর বি তা, শক্তি- ক্ষমতা, তাঁর অনাদিকাল থেকে অনন্ত- অসীম কাল পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকা ইত্যাদি সব গুণ- বৈশিষ্ট্যাবলীই তাঁর সহজাত বৈশিষ্ট্য। আর তাঁর স া এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহর গুণ- বৈশিষ্ট্যাবলী সৃষ্টির বস্তুর গুণ- বৈশিষ্ট্যের মত নয়। সৃষ্টির বস্তুর বৈশিষ্ট্যাবলী পরস্পর থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন এবং তাদের স া একে অপর

থেকে আলাদা। অবশ্য আল্লাহর অবিকল স ার সাথে তাঁর গুন- বৈশিষ্ট্যাবলী সহজাত হওয়ার বিষয়টি গভীর মনোযোগ সহকারে সুদর্শনের প্রয়োজন।

(গ)- ক্রিয়াগত এক বাদ : অর্থাৎ প্রত্যেকটি কাজ- কর্ম, ভূমিকা ও নির্দশন যা কিছু এ পৃথিবীতে দেখা যায়, সবই মহান আল্লাহর ইচ্ছা- আকাংখা থেকেই গোড়া প ন লাভ করেছে।

মহান আল্লাহ বলেন :

(اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ)

"মহান আল্লাহই সব কিছুর সৃষ্টি কর্তা এবং তিনিই এ গুলোর সংরক্ষণকার, (সূরা : যুমার আয়াত নং ৬২)।

আল্লাহ আরো বলেন :

(لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)

"সমগ্র আকাশ- মণ্ডল ও ভূ- মণ্ডলের চাবিকাঠি তাঁরই নিয়ন্ত্রনাধীন, (সূরা : আশশূরা আয়াত নং ১২)।

জী হ্যাঁ! "অস্তি র জগতে আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভাবশালীর অস্তি নেই।"

কিন্তু এ কথার অর্থ এ নয় যে, আমরা আমাদের কাজকর্মের ক্ষেত্রে নিজেরা কোন অধিকার রাখি না। বরং এর বিপরীতে আমরা আমাদের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

আল্লাহ বলেন :

(إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا)

অর্থাৎ আমরাই তাকে (মানূষকে) পথ দেখিয়েছি (তার পথ তার জন্যে সুগম করে দিয়েছি) চাই সে কৃত তার পথ অবলম্বন ক ক অথবা বিদ্রোহ করে অকৃত তার রাস্তা বেছে নিক, (সূরা ইনসান আয়াত নং ৩)।

আল্লাহ্ আরো বলেন :

(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)

অর্থাৎ আর মানুষ তার চেষ্টা- সাধনা দ্বারা অর্জিত ছাড়া আর কোন কল্যাণ লাভ করবে না, (সূরা আন নাজম আয়াত নং ৩৯)।

আল কোরআনের এ আয়াতসমূহ স্পষ্ট ঘোষণা করছে যে, মানুষ তার কাজ- কর্ম ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ্ আমাদের কাজ- কর্ম, চিন্তা- চেতনা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দান করেছেন সেহেতু আমাদের কৃতকর্মের পরিণাম এরই উপর ভি করে হবে। এ পর্যায়ে আমাদের কাজ- কর্মের মোকাবিলায় আমাদের দ্বায়ি - কর্তব্য মোটেও কমানো হবে না। ব্যাপারটি খুবই প্রণিধান যোগ্য।

জী হ্যাঁ! মহান আল্লাহ্ চান যে, আমরা আমাদের কাজ- কর্মগুলো স্বাধীনতার সাথে আঞ্জাম দেই, যাতে করে এ পথে তিনি আমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন এবং আমাদেরকে পর্যায়ক্রমে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। কেননা, একমাত্র স্বাধীন ইচ্ছার মাধ্যমেই এবং স্বাধীকারভাবে আল্লাহর আনুগত্যের পথ অতিক্রম করার মাধ্যেমেই মানুষ পরিপূর্ণতার শীর্ষে আরোহণ করতে পারে। এ কারণে যে, স্বাধীনতাহীন ও জোরপূর্বকভাবে আদায়কৃত আমল দ্বারা কারো ভালো- মন্দের বিচার করা যায় না।

নীতিগতভাবে আমরা যদি আমল করার ক্ষেত্রে বাধ্য বাধকতার শিকার হতাম তাহলে নবী- রাসূলগণের প্রেরণ ও আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করার কোনই অর্থ থাকতো না। অনুরূপভাবে, দ্বীনি দায়ি - কর্তব্য, শিক্ষা- প্রশিক্ষণ ও শাস্তি ইত্যাদিও অর্থহীন ও অন্তসারশূণ্য থেকে যেত।

এ বিষয়টি আমরা রাসূলের আহলে বাইতের ইমামগণের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছি। তাঁরা আমাদেরকে বলেছেন : "জাবর" তথা বলপূর্বকনীতি সঠিক নয় আবার "তফভীয" তথা নিজের অধিকারকে অপরের হাতে অর্পণ করার নীতিও সঠিক নয়। বরং প্রকৃত ও আসল নীতি হচ্ছে এ দু' য়ের মাঝামাঝি নীতি, (উছূলে কাফি, প্রথম খঃ পৃঃ ১৬০)।

(ঘ) ইবাদাতগত এক বাদ : অর্থাৎ ইবাদত কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট। তিনি ছাড়া আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নেই। এক বাদের এ বিষয়টি অত্যন্ত গু পূর্ণ বিষয় হিসাবে পরিগণিত। আল্লাহর নবী- রাসূলগণ অধিকাংশ সময় এরই অবলম্বী ছিলেন।

আল্লাহ্ বলেন :

(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)

তাঁদেরকে (নবীগণকে) এ ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তাঁরা কেবলমাত্র আল্লাহরই ইবাদত- উপাসনা করবেন। আর নিজেদের দ্বীন- ধর্মকে তাঁর (আল্লাহর) জন্যে নির্ভেজাল করবে এবং শিরক্ থেকে এক বাদে প্রত্যাবর্তন করবে। আর এটাই হল আল্লাহর স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় দ্বীন, (সূরা : বাইয়্যেনাহ্ আয়াত নং ৫)।

চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার পর্যায় অতিক্রম করার জন্যে এক বাদের ইবাদত আরো গভীর ভূমিকা রাখবে, যে কারণে মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহর সাথে নিজের অন্তরকে সম্পর্কযুক্ত দেখবে। সব জায়গাতে তাঁকেই স্মরণ করবে আর তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে নিজের চিন্তা- ভাবনার জগতে স্থান দিবে না। আর কোন কিছুই তাকে আল্লাহর চিন্তা- স্মরণ থেকে সরিয়ে অন্য চিন্তায় লিপ্ত করবে না।

অর্থাৎ যা কিছুই তোমাকে তার ব্যাপারে চিন্তা করায় বাধ্য করে এবং আল্লাহর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, সেটাই তোমার উপাস্য বলে গণ্য হবে।

আমাদের বিশ্বাস : এক বাদের শাখাসমূহ কেবল এ চারটি শাখাতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং মালিকানার এক বাদ অর্থাৎ সব কিছুর আধিপত্য ও অধিকার একমাত্র আল্লাহর।

আল্লাহ্ বলেন :

(لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ)

“অর্থাৎ আসমান ও জমিন যা কিছু আছে সব কিছুর উপর আল্লাহরই আধিপত্য ও স াধিকার রয়েছে। (সূরা : বাকারা, আয়াত নং ২৮৪।)

সার্বভৌমে র এক বাদ : অর্থাৎ কেবলমাত্র আল্লাহরই আইন- বিধি পরিচালিত হবে। আল্লাহ্ বলেন :

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)

“আর যারা আল্লাহর প্রেরিত বিধান অনুযায়ী বিচার- ফয়সালা করে না, এমন সব লোকেরা হচ্ছে কাফের (আল- মায়েদা : ৪৪)।

৭. নবীগণের মু' জিযাহ্ আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে :

আমরা বিশ্বাস করি : আসল ক্রিয়াগত এক বাদ এ বাস্তবতার প্রতি অত্যন্ত গু ারোপ করে যে, নবী- রাসূলগণ কর্তৃক যে সমস্ত অসাধারণ ও অলৌকিক ঘটনাবলী - যা মু' জিযাহ সংঘঠিত হত সেগুলো সবই ছিল মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে। যেমন আল কোরআনে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে :

(وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي)

"আর তুমি আমারই অনুমতিক্রমে জন্মগত অন্ধ লোকদেরকে, দূরারোগ্য কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত্য লোকদেরকে নিরাময় করে দিতে এবং আমারই আদেশে মৃতদেহকে জীবিত করতে। (সূরা : আল- মায়েদাহ্, আয়াত নং ১১০)।

হযরত সুলাইমানের (আঃ) একজন মন্ত্রী সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন :

(قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ)

"যার নিকট আসমানী গ্রন্থের ান ছিল সে বলল : চোখের পলক দেয়ার পূর্বেই আমি তা (সাবা সম্রা ীর বিলকিসের সিংহাসনটিকে) এনে আপনার সন্মুখে উপস্থিত করবো। অতঃপর (হযরত সুলাইমান (আঃ)) যখন তা নিজের চোখের পলকের সামনে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত দেখতে পেলেন তখন বললেন : এটা আমার প্রভুরই অনুগ্রহ। (সূরা : আন- নামল আয়াত নং ৪০)

অতএব, দূরারোগ্য ও ব্যধিগ্রস্তদের নিরাময় করা, জন্মান্ধকে চক্ষু দান করা এবং মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা, এ কাজগুলো হযরত ঈসা (আঃ) মহান আল্লাহরই অনুমতি ও আদেশক্রমে করেছিলেন; যা আল- কোরআনে উল্লেখ হয়েছে তা এক বাদেরই প্রতিভু।

৮. আল্লাহ্র ফেরেশতা :

আমরা বিশ্বাস করি : আল্লাহর ফেরেশ্তাদের অস্তি রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই বিশেষ বিশেষ দায়িে নিয়োজিত। কোন কোন ফেরেশ্তা নবী- রাসূলগণের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ বা ওহী পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত। (সূরা বাকারাহ আয়াত নং ৯৭)

একদল ফেরেশ্তা মানুষের কাজ- কর্ম তথা আমল অনুশীলনের সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত। (সূরা : ইনফিতার আয়াত নং ১০)

আরেকদল ফেরেশ্তা রূহ কবয করা তথা মৃত্যু সংঘটিত করার কাজে নিয়োজিত। (সূরা আরাফ আয়াত নং ৩৭)

আরেকদল ফেরেশ্তা অবিচলভাবে মু'মিনদের সাহায্য- সহযোগিতার কাজে নিয়োজিত। (সূরা : ফুচ্ছিলাত আয়াত নং ৩০)

অন্য একদল ফেরেশ্তা যুদ্ধের ময়দানে মু'মিনদের সাহায্যের কাজে নিয়োজিত। (সূরা আহযাব আয়াত নং৯)

আরেকদল ফেরেশতা খোদাদ্রোহী জাতিগুলোকে শায়েস্থা করার (শাস্তি দেয়ার) কাজে নিয়োজিত, (সূরা : হুদ আয়াত নং ৭৭)।

এভাবে আরো অন্যান্য দলে বিভক্ত ফেরেশ্তারা এ পৃথিবীতে বিভিন্ন দায়ি - কর্তব্যে লিপ্ত আছেন। নিঃসন্দেহে এ সব দায়ি - কর্তব্য যেমন আল্লাহর অনুমতি, আদেশ ও খোদায়ী শক্তির বলে প্রতিপালিত হয়ে আসছে তেমনি মূল ক্রিয়াগত এক বাদের সাথে কোন অসংগতি ও বিরোধ নেই। বরং আরো অধিক গু ে র দাবীদার।

এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, নবী- রাসূল, মা'সুম ও ফেরেশ্তাদের শাফাআ' ত করার বিষয়টি যেহেতু আল্লাহর অনুমতিক্রমে সেহেতু তা এক বাদেরই নামান্তর । আল্লাহ্ বলেন : কোন সুপারিশকারীই নেই তাঁর অনুমতি ছাড়া, (সূরা : ইউনুস. আয়াত নং ৩)। এ বিষয়ে আরও অধিক কথা- বার্তা এবং তাওয়াস্সুলের বিষয়ে নবুয়্যাতের অধ্যায়ে আলোচনা করব।

৯. ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট :

আমরা বিশ্বাস করি : ইবাদত কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট। (যেমন ইবাদতগত এক বাদের আলোচনায় উল্লেখ করেছি)। অতএব, যে ব্যক্তি তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করল সে মুশরিক। সমস্ত নবী- রাসূলগণের দাওয়াত এরই মধ্যে কেন্দ্রীয়ভূত ছিল। আল্লাহ্ বলেন :অর্থাৎ কেবলমাত্র মহান আল্লাহরই ইবাদত করো, কেননা তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বুদ নেই, (সূরাঃ আল- আরাফ, আয়াত নং ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫)।

এটা এমন একটা বক্তব্য যে, কোরআন মজীদে বারবার নবী- রাসূলগণকে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ্ এ কথাটি বলেছেন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, আমরা মুসলমানরা সব সময় নিজেদের নামাজের মধ্যে যখন সূরা : ফাতিহা তিলাওয়াত করি তখন এ ঘোষনাটি বারবার উচ্চারণ করি : আমরা শুধুমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর কেবলমাত্র তোমারই নিকট চাই সাহায্য। এ কথা স্পষ্ট যে, নবী- রাসূল ও ফেরেশ্তাদের সুপারিশ আল্লাহর অনুমতি ও আদেশক্রমে হয় - যা কোরআনের আয়াতসমূহে এসেছে, এ বিশ্বাসের অর্থ ইবাদত নয়। অনুরূপভাবে "তাওয়াসসুল" তথা নবী- রাসূলগণের সহায়তা চাওয়া। তাঁদের কাছে চাওয়ার হচ্ছে অর্থে যে, তাঁরা যেন মহান আল্লাহর পাকের দরবারে তাওয়াসসুলকারী ব্যক্তির সমস্যার সমাধান চান, এটা ইবাদত উপাসনা হিসাবেও গণ্য হবে না, আর এটা ক্রিয়াগত এক বাদ বা ইবাদতগত এক বাদের সাথেও কোন বিরোধ সৃষ্টি করবে না। এ বিষয়ের ব্যাখ্যা নবুয়্যাতের অধ্যায়ে আসবে।

১০. আল্লাহর অস্তিত্বের প্রকৃত রহস্য সবার জন্য গোপন রয়েছে :

আমরা বিশ্বাস করি : মহান আল্লাহর শক্তির নিদর্শনাদি ও প্রভাব, সমগ্র সৃষ্টি জগতে ব্যাপকভাবে ছেয়ে থাকা সে ও তাঁর অস্তিতের প্রকৃত রহস্য কারো কাছেই স্পষ্ট নয়। কেউ তাঁর অস্তি ে র গু রহস্য খুঁজে বের করতে সক্ষম নয়। কেননা, তাঁর অস্তি ে র বিষয়টি সকল দিক থেকেই সীমিত ও সীমাবদ্ধ। এ কারণেই তাঁর অস্তি ে র রহস্য আয়ে আনা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণরূপে তারঁই আয়া াধীন। আল্লাহ্ বলেন :

“মনে রেখো! সব কিছু তাঁরই আয় াধীন’ (সূরা : ফুচ্ছিলাত, আয়াত নং ৫৪)।

আল্লাহ্ আরো বলেন :‘মহান আল্লাহ্ সব কিছুর উপর পূর্ণ আয়া রাখেন’ (সূরা : আল- বু জ, আয়াত নং২০)।

কবি হাকীম বলেন :

তববুদ্ধি পর হাকীম দম্ভ কত আর?
যত ভাবো তত দূর- কোথা পাবে পার?
কত যে জটিল প্রভূভেদ বুঝা নাহি যায়;
ডুবন্ত নাবিক সায়রে যাঁচে- তৃণ যদি পায়।

মহা নবী (সঃ) থেকে একটি বিখ্যাত হাদীস আছে। তিনি বলেন :

‘তোমার যতটুকু অধিকার ছিল আমরা ততখানি ইবাদত করতে পারিনি। আর তোমার যে পরিচয় জানা দরকার ছিল, আমরা সেভাবে তোমাকে চিনতে পারিনি’ (বিহা ল আনোয়ার ৬৮ খঃ, ২৩ পৃঃ)।

এখানে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ নেই। উল্লেখিত বক্তব্যের অর্থ এ নয় যে, যেহেতু আমরা মহান আল্লাহর মূল অস্তি ে র ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ াত নই, কাজেই তাঁর পরিচয় জানার লক্ষ্যে সাধারণ ান- বি ান থেকেও হাত গুটিয়ে নেব এবং আল্লাহর মা’রিফাত সম্পর্কিত কিছু শব্দ আওড়াতে থাকব - যার কোনই তাৎপর্য নেই।

বস্তুতঃ এ ধরনের মা’রিফাত - যার তাৎপর্য অনুদঘাটিত, তা আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত নয় এবং আমরা তাতে বিশ্বাসীও নই। কেননা, মহাগ্রন্থ আল- কোরআন ও অন্যান্য সমস্ত আসমানী কিতাবসমূহ আল্লাহর মা’রিফাত বা পরিচয় তুলে ধরার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

এ পর্যায়ে যথেষ্ট উদাহরণ উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেমন, আমরা রূহ বা আত্মার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানি না যে, তা কী? কিন্তু নিঃসন্দেহে আত্মা সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা ও পরিচিতি জানা আছে। আমরা জানি যে, আত্মার অস্তি আছে এবং তার প্রভাব ও নিদর্শন আমরা প্রত্যক্ষ করি।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলী আল বাকের (আঃ) থেকে এ পর্যায়ে একটি আকর্ষণীয় হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন :

‘প্রত্যেক বস্তুকে যখন চিন্তা- ভাবনা ও ধ্যান- ধারনা দ্বারা তার যথার্থ অর্থের কথা কল্পনাকরবে তখন তা হবে তোমারই সৃষ্ট ও নিরূপিত এবং তা তোমাদের নিজেদের মতই হবে, আর তোমাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে’ (বিহা ল আনোয়ার, খঃ- ৬৬, পৃঃ ২৯৩)।

আমী ল মু' মিনীন হযরত আলী (আঃ) থেকে অন্য একটি হাদীসে আল্লাহর মা’রিফাত ও পরিচয় সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর ও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন :

‘মহান আল্লাহ্ আকল- বুদ্ধি ও বিবেককে স্বীয় (অস্তি গত) মারিফাত সম্পর্কে অবহিত করেননি। পক্ষান্তরে স্বীয় মা' রিফাত ও পরিচিতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অবগতি অর্জনের পথে অন্তরায় ও বাঁধার সৃষ্টি করেননি এবং বাতিল করেননি’ (গুরা ল হিকাম)।

১১. তা' তীলও নয় তাশবীহ্ও নয় :

আমরা বিশ্বাস করি : যেমনি ভাবে “তাতীল” তথা মহান আল্লাহর অস্তি র প্রকৃত রহস্য জানা সঠিক কাজ নয় তেমনিভাবে আল্লাহকে কারো সাথে, ‘তাশবীহ’ তথা সমকক্ষ ও সমতুল্য মনে করা কিংবা কোন আকার আকৃতির সাথে তুলনা করার কাজে অবতীর্ণ হওয়া ভুল ও শিরক জনিত কাজ। অর্থাৎ আমরা একথা বলতে পারব না যে, মহান আল্লাহকে আদৌ চেনা যাবে না এবং তাঁকে চেনার রাস্তাও উন্মুক্ত নয়, যেমন তাঁকে কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা করা যায় না। এ দু' টি নীতির একটি হলো ' এফরাত' তথা অতির ন ও বাড়াবাড়ি আর দ্বিতীয়টি হলো ' তাফরীত' তথা চরমবাড়াবাড়ি ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবী আল্লাহর বার্তা বাহক

১২. নবী প্রেরণের দর্শন :

মহান আল্লাহ্ মানব জাতিকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্যে এবং মানুষদেরকে বাঞ্ছিত পূর্ণাঙ্গতা ও চির কল্যাণময় স্থানে পৌঁছানোর জন্যে নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। আর যদি তাঁদেরকে না পাঠাতেন তাহলে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই অর্জিত হত না। আর মানুষ পথভ্রষ্টতার ঘূর্ণাবর্তে হাবুডুবু খেত এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত হত। আল্লাহ্ বলেন :

'এ নবী- রাসূলগণ সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী ছিলেন- যাতে করে মানুষের জন্যে মহান আল্লাহর " হুজ্জাত"(দলীল- প্রমাণ) অবশিষ্ট না থাকে। (আর কল্যাণের পথ সকলকে দেখিয়ে দিবেন ও সকলের প্রতি হুজ্জাত সমাপ্ত করবেন) আর মহান আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী ও সর্বা ' (সূরা : আন নিসা, আয়াত নং ১৬৫)।

আমরা বিশ্বাস করি : এ নবী- রাসূলগণের মধ্যে পাচঁজন "উলুল আযম" অর্থাৎ তাঁরা পূর্নাঙ্গ শরীয়াত, আসমানী কিতাব ও নতুন বিধি- বিধান আনয়নকারী। তাঁদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন হযরত নূহ (আঃ)। অতঃপর ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ)। আর তাঁদের সর্বশেষ হচ্ছেন হযরত মুহম্মাদ (সাঃ)। আল্লাহ্ বলেন :

"স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন আমরা নবী- রাসূলগণের কাছ থেকে অঙ্গিকার নিয়েছিলাম। এভাবে আপনার কাছ থেকে এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের (আঃ) কাছ থেকে। আর আমরা তাদের সকলের কাছ থেকেই দৃঢ় প্রতি া ও প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলাম। (এ মর্মে যে, তাঁরা রেসালতের দায়ি - কর্তব্য প্রতি পালনে ও আসমানী কিতাব প্রচার- প্রকাশে স্বচেষ্ট থাকবে)' সূরা : আল- আহযাব, আয়াত নং ৭।

আল্লাহ্ আরও বলেন :

‘ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন কর, যেমনভাবে উলুল আযম রাসূলগণ ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন করেছিলেন’ (সূরা : আল- আহকাফ, আয়াত নং৩৫)।

আমরা বিশ্বাস করি : সমস্ত নবীগণের মধ্যে সর্ব শেষ নবী এবং রাসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল- বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)। তিনি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্যে নবী এবং পৃথিবীর শেষাবধি তিনিই নবী থাকবেন অর্থাৎ তাঁর অনুসৃত সার্বজনীন বি তা, বিধি- নিষেধ ও ইসলামী শিক্ষা- দীক্ষা এমন যে, পৃথিবী অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত মানুষের পার্থিব ও পরকালের জীবনের সমস্ত চাহিদা- প্রয়োজন মিটানোর ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। তাঁর পরে যে কেউ নতুন করে নবুয়্যাত বা রেসালাতের দাবীদার হবে সে ভি হীন ও বাতিল বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন :

“মুহাম্মাদ (সাঃ) তোমাদের পু ষদের মধ্যে কারো (ডাকা) পিতা ছিলেন না। কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং নবুয়্যাতের ধারা সমাপ্তকারী। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে াত আছেন। (যা কিছু প্রয়োজন ছিল সবই তাঁর অধিকারে দিয়েছেন)” (সূরা : আহযাব, আয়াত নং ৪০)।

১৩. অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে সহাবস্থান :

যদিও আমরা এ যুগে ইসলামকেই একমাত্র আল্লাহর গ্রহণযোগ্য দ্বীন বলে জানি ও মানি কিন্তু আমরা অন্যান্য আসমানী দ্বীনের অনুসারীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানেও বিশ্বাসী। চাই তারা ইসলামী দেশে বসবাস ক ক অথবা মুসলিম বিশ্বের বাইরে জীবন যাপন ক ক। কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি ইসলাম ও মুসলমানদের বি দ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তাহলে আল্লাহ্ বলেন :

“আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না সে সব লোকদের সাথেসদাচরণ ও ইনসাফ করতে যারা দ্বীন ও ধর্ম বিষয়ে তোমাদের বি দ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দেয়নি, বস্তুতঃ ন্যায়াচারীদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন” (সূরা : আল- মুমতাহিনাহ্ আয়াত নং ৮)

আমরা বিশ্বাস করি : যুক্তিসংগত আলোচনা দ্বারা ইসলামের প্রকৃত রূপ ও তার শিক্ষা- সংস্কৃতির সৌন্দর্য সারা দুনিয়ার মানুষের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা যায় এবং ইসলামের আকর্ষণীয় বিষয়গুলোকে এত শক্তিশালী মনে করি যে, যদি সঠিক ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয় তাহলে মানব জাতির অনেক লোককেই এদিকে আকৃষ্ট করা যাবে। বিশেষভাবে, নানাবিধ সমস্যা-জর্জরিত আজকের পৃথিবী ইসলামের আহ্বান শুনার জন্যে বর্তমানে কান পেতে বসে আছে।

এ কারণেই আমরা বিশ্বাস করিঃ ইসলামকে বল প্রয়োগ ও চাপ সৃষ্টির পন্থায় কারো উপর চাপিয়ে দেয়া উচিৎ নয়। আল্লাহ্ বলেন :

‘দ্বীন গ্রহণ করার ব্যাপারে জোর- জবরদস্তির কোন দরকার নেই। কেননা সত্য, অসত্য থেকে পরিস্কার হয়ে গেছে’ (সূরা : আল- বাকারাহ্, আয়াত নং ২৫৬।)

আমরা বিশ্বাস করি : ইসলামের সামাজিক বিধি- বিধানসমূহের উপর যদি মুসলমানরা আমল-অনুশীলণ করে তাহলে তা ইসলামের পরিচয় তুলে ধরার জন্যে বিরাট কাজ। কাজেই ইসলামকে জোরপূর্বক কারো উপর চাপিয়ে দেয়ার দরকার নেই।

১৪. নবীগণ আজীবন মা'সুম (নিষ্পাপ) :

আমরা বিশ্বাস করি : সমস্ত নবী- রাসূলগণ মা'সুম বা নিষ্পাপ অর্থাৎ তাদের সমস্ত জীবন (নবুয়্যাতের পূর্বে হোক অথবা পরে হোক) সব রকমের গুনাহ্ ও ভুল- ত্রুটি থেকে আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতায় নিরাপদে থাকা। কেননা, যিনি নবী হবেন তিনি যদি গুনাহ কিংবা ভুল- ত্রুটির মধ্যে লিপ্ত হন তাহলে নবুয়্যাতের পদের জন্যে যে আস্তা ও নির্ভরতা দরকার তা হারিয়ে যাবে এবং লোকেরা তাঁকে আল্লাহ্ ও তাদের নিজেদের মধ্যেকার একজন নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসাবে মেনে নিবে না। আর তাঁকে জীবনের সমস্ত কাজ- কর্মের ক্ষেত্রে নিজেদের আদর্শ নেতা হিসাবে মেনে নিবে না।

এ কারণেই আমরা বিশ্বাস করি : যদিও কোরআনের কোন কোন আয়াতে বাহ্যিকভাবে কোন কোন নবীর গুনাহ্ সম্পর্কে ইংগিত করা হয়েছে; যেমন : (তারকে আওলা) (অর্থাৎ দু' টি ভাল কাজের মধ্যে যে কাজটি কম ভাল সেটি গ্রহণ করেছেন। বস্তুতঃপক্ষে উচিৎ ছিল অধিক ভাল কাজটি বাছাই করা।) অথবা অন্য কথায় যেমন : 'নেককার লোকদের ভাল কাজ কখনও নৈকট্য হাসিলকারীদের গুনাহ্ হিসাবে পরিগণিত হয়'। কেননা, প্রত্যেকের কাছে তার পদ- মর্যাদা হিসাবে কাজ- কর্ম আশা করা হয়। (আল্লামা মাজলিসী বিহা ল আনোয়ারে এই হাদীসটির কোন ইমামে বলেছেন তা উল্লেখ না করে বলেছেন, কোন এক ইমাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। (বিহা ল আনোয়ার, ২৫ তম খঃ, পৃঃ ২০৫)।

১৫. তাঁরা আল্লাহর অনুগত বান্দা :

আমরা বিশ্বাস করি : নবী- রাসূলগণের সবচেয়ে বড় গর্ব ও গৌরবের বিষয় ছিল এই যে, তাঁরা আল্লাহর অনুগত ও বাধ্যগত বান্দা ছিলেন, এ কারণেই আমরা প্রতিদিন আমাদের নামাযসমূহে আমাদের নবী (সাঃ) সম্পর্কে এ বাক্যটি বার বার উচ্চারণ করি : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল'।

আমরা বিশ্বাস রাখি : কোন একজন নবী ও "উলুহিয়্যাত" তথা নিজেকে উপাস্য হিসাবে দাবী করেননি এবং লোকদেরকে তাঁদের পুজা করার জন্যে আহ্বান জানাননি। আল্লাহ্ বলেন :

'কোন মানুষের পক্ষেই এটা সমিচীন নয় যে, মহান আল্লাহ্ তাকে ঐশী কিতাব, বি তা ও নবুয়্যাত দান করবেন, অতঃপর সে লোকদেরকে বলবে যে, আল্লাহকে ত্যাগ করে আমার উপাসনা কর' (সূরা : আলে ইমরান ৭৯)।

এমনকি হযরত ঈসাও (আঃ) কখনও লোকদেরকে তাঁর পুজা করতে আহ্বান জানাননি এবং সব সময় নিজেকে আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত পু ষ বলে জানতেন। আল্লাহ্ বলেন :

'ঈসা (আঃ) কখনও একথা অস্বীকার করেননি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা। আর (আল্লাহর) নৈকট্য লাভকারী ফেরেশ্তাও (কখনো নিজেদেরকে আল্লাহর বান্দা হিসাবে অস্বীকার করেননি' (সূরা : নিসা ১৭২)।

খৃষ্টবাদীদের এখনকার ইতিহাসই সাক্ষী দেয় যে, "ত্রি বাদ বিশ্বাস" (তিন খোদার বিশ্বাস) খৃষ্টবাদের প্রথম শতাব্দীতে অস্তি ছিল না। তাদের এ ত্রি বাদের মতবাদ পরবর্তীতে সৃষ্টি হয়েছে।

১৬. মু' জিযাহ্ ও ইলম- ই- গায়েব :

নবী- রাসূলগণের উপাসনা ও বন্দেগী কখনও এ বিষয়ের বাঁধা হতে পারে না যে, তাঁরা আল্লাহর অনুমতি ও আদেশক্রমে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে কোন গোপন বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন : 'মহান আল্লাহ্ই গায়েবী (অদৃশ্যের) বিষয়ে পরি াত। তিনি তাঁর গায়েবী- গোপন বিষয়ে কাউকে অবহিত করেননা। কিন্তু সে রাসূলকে (অবহিত করেন) যাকে তিনি মনোনীত করেন' (সূরা : আল- জিন্ন, আয়াত নং ২৬- ২৭)।

আমরা জানি : হযরত ঈসার (আঃ) মু' যিজাহসমূহের মধ্যে এমন একটা মু'যিজাহ্ ছিল যে, তিনি কোন কোন গোপন বিষয়ের আংশিক সংবাদ লোকদের মধ্যে পরিবেশন করতেন। যেমন :'তোমরা তোমাদের ঘরে যা কিছু খাও এবং যা কিছু জমা করে রাখো তা আমি ঈসাতোমাদেরকে বলে দিতে পারব' (সূরা : আল- ইমরান ৪৯)।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে অনেক গোপন সংবাদ বর্ণনা করতেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন :'এটা অদৃশ্যের গোপন সংবাদসমূহ থেকে একটি, যা অহীর মাধ্যমে আমি তোমাকে শিক্ষাদিচ্ছি' (সূরা : ইউসুফ ১০২ নং আয়াত)।

অতএব, কোন বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতাই থাকতে পারেনা যে, নবী- রাসূলগণ আল্লাহর আদেশ ও অনুমতিক্রমে গায়েবের গোপন সংবাদ পরিবেশন করবেন। যদিও কোরআনের কোন কোন আয়াতে রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর ইলম- ই- গায়েব সম্পর্কে নেতিবাচক ইংগিত রয়েছে। যেমন : 'আমি গায়েব সম্পর্কে অবগত নই আর আমি একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশ্তা' (সূরা : আল- আনআম ৫০)।

এ আয়াতে যে ইলম- ই- গায়েবের কথা বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজাতগত বা সা াগত ও স্বকিয়তাগত ইলমে গায়েব। না ঐ ইলম যা আল্লাহ্ কর্তৃক শিক্ষার মাধ্যমে হাসিল হয়। কেননা, আমরা জানি যে, কোরআনের আয়াত একে অপরের ব্যাখ্যা বিশ্লেষক ও সম্পূরক। আমরা বিশ্বাস করি : এ মহান নবী- রাসূলগণ অলৌকিক কর্ম- কান্ড ও গু পূর্ণ মুজিযাহসমূহ

মহান আল্লাহরই অনুমতিক্রমে করেছেন। আর তাঁদের এ ধরনের কর্ম-কান্ড আল্লাহর অনুমতিক্রমে আঞ্জাম দেয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, না শিরক হবে আর না তাঁদের আল্লাহর বান্দা হওয়ার ব্যাপারে বিরোধের অবকাশ আছে। কোরআনের বিশ্লেষনে দেখা যায়, হযরত ঈসা (আঃ) মৃতকে আল্লাহর অনুমতিক্রমে জীবিত করতেন এবং দূরারোগ্য রোগীদেরকে আল্লাহর আদেশে সুস্থ করতেন। আল্লাহ্ বলেন :'আর আমি আরোগ্য করি জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ গীকে। আর জীবিত করি মৃতকে আল্লাহর অনুমতি বা আদেশক্রমে' (সূরা : আলে ইমরান ৪৯)।

১৭. নবীগণ শাফায়াতের অধিকারী :

আমরা বিশ্বাস করি : সমস্ত নবী-রাসূলগণ ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সুপারিশ করার মর্যাদার অধিকারী এবং বিশেষ একটা শ্রেণীর লোকদের জন্যে মহান আল্লাহর দরবারে শাফায়াত করবেন। কিন্তু সেটাও মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে। মহান আল্লাহ্ বলেন :'কোন সুপারিশকারী নেই; শুধুমাত্র আল্লাহর অনুমতি ব্যাতীত'। (সূরা : ইউনুস আয়াত নং ৩)

মহান আল্লাহ্ বলেন :'কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে? (সূরা : আল-বাকারা আয়াত নং ২৫৫)

যদিও কোন কোন আয়াতে আল্লাহ্ সাধারণভাবে শাফায়াতের ব্যাপারে নেতিবাচক কথা বলেছেন, যেমন :

'আল্লাহর পথে খরচ কর, সেই নির্ধারিত দিনটি উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই যে দিন কোন বেচা-কেনা চলবে না (যে, কেউ তার নিজের মুক্তি ও কল্যাণ কিনতে পারবে) আর না বন্ধু কোন কাজে আসবে, আর না কারো শাফায়াত'(সূরা : বাকারাহ্ ২৫৪)।

এরূপ ক্ষেত্রে শাফায়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীনভাবে নিজের থেকে ও আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করা অথবা সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সুপারিশ করার যোগ্যতা রাখে না। কেননা, বার বার বলা হয়েছে যে, কোরআনের আয়াতসমূহ একটি আরেকটির সম্পূরক ও বিশ্লেষক। আমরা বিশ্বাস করি : সুপারিশ বা শাফায়াতের বিষয়টি লোকদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের

জন্যে, পাপীদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে, পবিত্রতা ও খোদাভী তা হাসিলের জন্যে এবং তাদের অন্তরে আশার আলো সঞ্চার করার জন্যে একটা উ ম উছিলা। কেননা, সুপারিশের ব্যাপারটি হিসাব কিতাব বিহীন কোন বিষয় নয়। সুপারিশ শুধুমাত্র সে ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রজোয্য যে তা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। অর্থাৎ তার পাপ ও অপরাধ এতখানি সীমা ছাড়িয়ে যাবে না যে, সুপারিশকারীর সাথে তার সম্পর্কের ছিন্নতা ঘটবে। কাজেই সুপারিশের বিষয়টি একটি সাবধানতা ও হুশিয়ারী, যাতে করে ব্যক্তি তার নিজের সমস্ত সিঁড়ি ও স্তরগুলোকে একেবারে ধবংস করে না দেয় ও ফিরে আসার পথ অবশিষ্ট রাখে এবং সুপারিশ লাভের সুযোগটা যেন হাত ছাড়া না করে।

১৮. তাওয়াস্সুল বা উছিলা গ্রহণ :

আমরা বিশ্বাস করি : তাওয়াস্সুল বা কারো শরণাপন্ন হয়ে সহায়তা গ্রহণের বিষয়টিও সুপারিশের বিষয়টির মতই একটি বিষয়। এ বিষয়টি এবং যে ব্যক্তি আত্মিক ও জাগতিক কোন বিপদের বা সমস্যার সন্মুখীন হবে তখন তার জন্যে সুযোগ থাকবে যে, তার সমস্যার সমাধানকল্পে অলি- আউলিয়াদের তাওয়াসসুল করে মহান আল্লাহর দরবারে এগিয়ে যাবে। অপর দিকে সে আল্লাহর অলি- আউলিয়াদেরকে উছিলা হিসাবে উপস্থাপন করবে। আল্লাহ্ বলেন : 'তারা যদি নিজেদের প্রতি নিজেরা জুলুম- অত্যাচার করার পর তোমার নিকট আসত এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত আর আল্লাহর রাসূলও তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তাহলে তারা আল্লাহকে অবশ্যই তওবা গ্রহণকারী ও ক নাময় হিসেবে পেত'(সূরা : আন- নিসা আয়াত নং ৬৪)।

এরূপে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ভাইদের ঘটনাতেও আমরা দেখি, তারা তাদের পিতার শরণাপন্ন হয়ে বলল :

'হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্যে মহান আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা ক ন! কেননা, আমরা বড়ই অপরাধী ছিলাম' (সূরা : ইউসুফ আয়াত নং ৯৭)।

তাদের বৃদ্ধ পিতা হযরত ইয়া'কুব (আঃ) তাদের এ আবেদন গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আর বললেন :'খুব শীঘ্রই আমি তোমাদের জন্যে আমার প্রভূর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করব' (সূরা : ইফসুফ, ৯৮ নং আয়াত)।

এই ঘটনাটি এ কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যেও তাওয়াস্সুলের নীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে যুক্তিসংগত সীমা অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়া উচিৎ নয়। আর অলি- আওলিয়াগণকে এ পর্যায়ে কার্যকারি ও খোদার অনুমতির ক্ষেত্রে নিস্প্রয়োজনীয়তা মনে করা শিরক ও কুফুরীর শামিল।

অনু পভাবে, অলি- আউলিয়াদের তাওয়াস্সুল কখনো তাদেরকে উপাসনা করা হচ্ছে এ দৃষ্টিতে দেখা উচিৎ হবে না। কেননা এরূপ হওয়াটাও শিরক ও কুফুরীর মধ্যে গণ্য। এ কারণে

যে, তাঁরা প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে, না কল্যাণ করার আর না ক্ষতি সাধনের অধিকারী। আল্লাহ্ বলেন : 'তাদেরকে বলে দাও! (এমনকি) আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধন ও ক্ষতি করার অধিকারী নই, কিন্তু ততটুকুরই অধিকারী যতটুকু আল্লাহ্ চাহেন' (সূরা : আল- আরাফ ১৮৮)।

সাধারণতঃ ইসলামী ফির্কাসমূহের প্রায় সব ফিরকাতেই অন্ততপক্ষে একদল সাধারণ মানুষকে এ তাওয়াস্সুলের ব্যাপারে সীমাতিক্রম ও বাড়াবাড়ি করতে দেখা যায়। এদের সংশোধন ও হেদায়েত হওয়া অত্যন্ত জ রী।

১৯. নবীগণের দাওয়াতের পদ্ধিতি অভিন্ন :

আমরা বিশ্বাস করি : আল্লাহর নবী- রাসূলগণ সকলেই একটা লক্ষ্য- উদ্দেশ্যকে অনুসরণ করতেন আর তা ছিল মানুষের কল্যাণ সাধন করা। আর তা আল্লাহর ও শেষ বিচার দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে, দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং মানব সমাজের চারিত্রিক বলিষ্ঠতার উন্নয়নের মাধ্যমে। এ কারণেই আমাদের নিকট সমস্ত নবী- রাসূলগণই সন্মানের পাত্র। এ কথাটি আল- কোরআনে আল্লাহ্ আমাদেরকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন : 'আমরা আল্লাহর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না' (সূরাঃ আল- বাকারাহ্ ২৮৫)।

যদিও হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) পূর্বে যতই দিন- কাল অতিবাহিত হত ততই মানুষ উচ্চতর ও অধিকতর শিক্ষার্জনের জন্যে আসত। অনুরূপভাবে আল্লাহর দ্বীনও ক্রমাগতভাবে পূর্ণতার দিকে এগুতে থাকল। আর তাদের শিক্ষা- দীক্ষা গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকলো। এভাবে আল্লাহর দ্বীন চুড়ান্তভাবে পরিপূর্ণতা লাভের পর্যায়ে এসে উপস্থিত হল। অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করল। আল্লাহ্ বলেন : 'আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনিত করলাম' (সূরা : আল- মায়িদা আয়াত নং ৩)।

২০. পূর্ববর্তী নবীগণের সংবাদ দান :

আমরা বিশ্বাস করি : অনেক নবীগণই তাঁর পরবর্তীতে আগত নবীর সংবাদ পরিবেশন করে গেছেন। যেমন : হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর আগমন সম্পর্কে সুস্পষ্ট সংবাদ পরিবেশন করে গেছেন, যার কোন কোনটি আজও তাদের গ্রন্থাবলীতে বর্তমান রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন :

(الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

'যারা আনুগত্য ও অনুসরণ করে এমন এক রাসূলের যিনি একজন উম্মী নবী, (তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলী ও নিদর্শনাদি) তারা তাদের কাছে যে ইঞ্জিল ও তাওরাত গ্রন্থ রয়েছে তাতে তারা স্পষ্ট লিখিত দেখতে পাচ্ছে, এরূপ লোকেরাই পূর্ণ সফলকাম' (সূরা : আল- আরাফ ১৫৭)।

এ কারণে ঐতিহাসিকগণ বলেন : রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্বে ইয়াহুদীদের বিরাট একটা দল মদীনায় আসলো এবং তাঁর আবির্ভাবের অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ থাকল। কেননা, তারা তাদের গ্রন্থাবলীতে দেখতে পেয়েছিল যে, তিনি এ ভু- খন্ড থেকে আবির্ভূত হবেন। যা হোক, প্রত্যাশিত এ উজ্জল সূর্যটি উদিত হবার পর একদল ইয়াহুদী ঈমান এনেছিল, আর অপর একটি দল যারা নিজেদের স্বার্থ- সুবিধাকে বিপদের সন্মুখীন দেখতে পেলো যার ফলশ্রুতিতে তারা তাঁর বিরোধীতায় লেগে গেল।

২১. নবীগণ ও জীবনের সার্বিক সংশোধন :

আমরা বিশ্বাস করি : নবী- রাসূলগণের প্রতি মহান আল্লাহ্ যে দ্বীন অবতীর্ণ করেছেন, বিশেষতঃ ইসলামী জীবন দর্শনের লক্ষ্য হচ্ছে শুধুমাত্র ব্যক্তি সংশোধন অথবা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক বিষয়াবলীর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সমাজ জীবনের সর্বাঙ্গে সংশোধন ও

জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় অনেক ান- বি ান এ নবী- রাসূলগণের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছে, কোন কোনটার ইংগিত স্বয়ং কোরআনেও রয়েছে।

আমরা আরো বিশ্বাস করি : এ সমস্ত খোদায়ী নেতৃবৃন্দের অধিকতর গু পূর্ণ লক্ষ্য- উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে অন্যতম একটি গু পূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে মানব সমাজে ন্যায়- নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ্ বলেন : 'আমরা আমাদের রাসূলগণকে স্পষ্ট দলিল- প্রমাণসহ পাঠিয়েছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণকরেছি আসমানী কিতাব ও (হক ও বাতিল চেনার ও ন্যায়নিষ্ঠার বিধি- বিধান সমৃদ্ধ)মানদন্ড- যাতে করে বিশ্ববাসীরা ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে' (সূরা : আল- হাদিদ, আয়াত নং ২৫)।

২২. গোত্র ও গোষ্ঠী পুজা নিষিদ্ধ :

আমরা বিশ্বাস করি : কোন নবী- রাসূলই বিশেষতঃ বিশ্বনবী (সাঃ) কোন প্রকার গোত্রগত ও গোষ্ঠিগত আভিজাত্যকে মেনে নেননি। বরং তাঁর দৃষ্টিতে জগতের সমস্ত ভাষা, গোষ্টী ও জাতি সমান মর্যাদার অধিকারি। তাইতো কোরআন বলেছে :

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

'হে লোক সকল! আমরা তোমাদেরকে একজন মাত্র পু ষ ও নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবংতোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীভুক্ত করেছি, যাতে করে পরস্পরকে সহজে চিনতেপার। অর্থাৎ এ সবগুলো শ্রেষ্ঠ ও আভিজাত্যের জন্য নয় বস্তুতঃ তোমাদের মধ্যে সেইব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি সন্মানিত যে ব্যক্তি, সবচেয়ে বেশী খোদাভী - পরহেযগার' (সূরা :আল হুজুরাত, আয়াত নং- ১৩)।

এ পর্যায়ে রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর একটি বিখ্যাত হাদীস আছে, যা তিনি (হজ্বের সময়) উটের পিঠে আরোহণ অবস্থায় মিনাতে লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতার আকারে বলেন :-

‘হে মানব সকল! জেনে রেখো : তোমাদের প্রভু এক। তোমাদের পিতাও এক। আরবরা আজমদের (অনারবদের) উপর কোন শ্রেষ্ঠে র অধিকারী নয়। আর না অনারবরা আরবদের উপর শ্রেষ্ঠে র দাবীদার হতে পারে। অনুরূপভাবে না কালোদের উপর শ্বেতাঙ্গ(চামড়া বিশিষ্টদের) আভিজাত্যের অবকাশ আছে, আর না শ্বেতাঙ্গদের উপর কালোদের আভিজাত্যের অবকাশ আছে; কিন্তু খোদাভী তা ও পরহেযগারীর ভি তে (অবশ্যই মর্যাদার পার্থক্য রয়েছে)। আমি কি আল্লাহর নির্দেশ তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি? সকলেই বলল : জী হ্যাঁ! তখনি বললেন : আমার এ বক্তব্যটি যারা উপস্থিত আছো তারাঅনুপস্থিত লোকদের নিকট পৌছে দিও । (তাফসীরে কোরতবী, নবম খঃ পৃঃ ৬১৬২)

২৩. ইসলাম ও মানব- প্রকৃতি :

আমরা বিশ্বাস করি : আল্লাহ্ ও তাঁর এক বাদে বিশ্বাস এবং নবী- রাসূলগণের শিক্ষানীতি মোটামুটি প্রকৃতিগতভাবেই সমস্ত মানুষের হৃদয়ে বর্তমান রয়েছে। আল্লাহর নবী- রাসূলগণ ফলদায়ক বীজগুলোকে পানি ও ওহী দ্বারা সিঞ্চন কাজ চালিয়ে, শিরক ও বিচ্যুতির আগাছা- পরগাছা তার আশপাশ থেকে দূর করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন :

(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)

‘অর্থাৎ (আল্লাহর বিধান হচ্ছে) আল্লাহর নির্ভেজাল প্রকৃতি- যার উপর সমগ্র মানব প্রকৃতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। খোদার এ সৃষ্টিনীতিকে কোন পরিবর্তন করা উচিৎ নয়। এটাই হচ্ছে খোদার মজবুত দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না’ (সূরা : আর- রূম ৩০)।

এ জন্যেই ইতিহাসের দীর্ঘ পাতায় সব সময়ই দ্বীন বর্তমান ছিল এবং বড় বড় ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস মতে দ্বীনশূন্য পৃথিবীর চিন্তা, বিরল ও ব্যতিক্রম ব্যাপার। এমনকি, যে জাতিসমূহ বছরের পর বছর ধরে দ্বীন বিরোধী প্রচার- প্রপাগান্ডার চাপের মুখে ছিল, তারা যখনই স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে, সাথে সাথেই আবার দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। কিন্তু একথা

অস্বীকার করার জো নেই যে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সাংস্কৃতিক অবস্থান নীচু থাকার কারণে আকীদা- বিশ্বাস ও দ্বীনি তাহ্যীব- তামাদ্দুন (সংস্কৃতি) কুসংস্কার যুক্ত হয়ে পড়ে ছিল এবং নবীগণের কর্মসূচীর সিংহভাগ কাজই ছিল এ কুসংস্কারের মরিচা দূর করা।

তৃতীয় অধ্যায়

কোরআন ও আসমানী কিতাবসমূহ

২৪. আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণের দর্শন :

আমরা বিশ্বাস করি : মহান আল্লাহ্ মানব জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্যে বেশ কয়েকটি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যেমন : ছুহুফে ইব্রাহীম, ছুহুফে নূহ, তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি। এর মধ্যে সঠিকভাবে পূর্ণাঙ্গতর হচ্ছে আল- কোরআন। যদি এ আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ না হত তাহলে মানুষ আল্লাহর পরিচিতি ও ইবাদত- বন্দেগীর ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হত। আর তাকওয়া- পরহেযগারী, চরিত্র- আখলাক, শিক্ষা- প্রশিক্ষণ ও সামাজিক নীতিমালা লাভের ক্ষেত্রে বঞ্চিত থেকে যেত।

এ আসমানী কিতাব সমূহ মানুষের হৃদয়ের মাঝে রহমতের বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হল এবং খোদাভী তা, চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, আল্লাহর পরিচয় ও ান- বি ানের বীজগুলোকে মানুষের মধ্যে রোপণ ও অংকুরিত করেছে। আল্লাহ্ বলেন :

(آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)

‘রাসূল (সাঃ), যা কিছু তাঁর প্রভূর পক্ষ থেকে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছিলেন এবং সকল মু’মিনিনও আল্লাহর ও তাঁর ফেরেশ্তাদের এবং প্রেরীতদের উপর ঈমান এনেছিলেন’ (সূরা : আল- বাকারাহ্ ২৮৫)।

যদিও দুঃখজনকভাবে কালের ঘূর্ণিচক্রে এবং অযোগ্য ও অ দের হস্তক্ষেপের ফলে অনেক আসমানী কিতাবই বিকৃতির শিকারে পরিণত হয়েছে এবং কূট চিন্তার দ্বারা মিশ্রিত হয়েছে, কিন্তু কোরআন মজীদ কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়াই যথাযথ রূপে অবশিষ্ট আছে এবং উজ্জল সূর্যের ন্যায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ও যুগের পর যুগ ধরে দীপ্তিমান হয়ে আছে ও মানুষের আত্মাসমূহকে আলোকিত করছে- যার দলীল- প্রমাণ পরবর্তীতে আলোচিত হবে। আল্লাহ্ বলেন :

(قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)

'খোদার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি এক নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। এর দ্বারা আল্লাহ্ সে সমস্ত লোকদেরকে কল্যাণ ও হেদায়েতের পথে পরিচালিত করেন- যারা সন্তুষ্টচিে তাঁর আনুগত্য করে' (সূরাঃ আল- মায়েদাহ্, ১৫- ১৬) ।

২৫. কোরআন বিশ্বনবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযাহ্ :

আমরা বিশ্বাস করি : আল- কোরআন রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর মু' জিযাহসমূহের অন্যতম একটি গু পূর্ণ মু' জিযাহ্। এটা কেবলমাত্র বাক অলংকার ও সুন্দর বাচনভঙ্গি, প্রাঞ্জল বর্ণনা ও অর্থের দিক থেকে গভীর তাৎপযের্র অধিকারী বলেই নয় বরং অন্যান্য কারণেও মু' জিযার অধিকারী, যার বিশ্লেষণ আমরা "আকায়েদ ও কালাম" নামক গ্রন্থে প্রদান করেছি।

এ কারণেই আমরা বিশ্বাস করি : এ পৃথিবীতে কেউ পারবে না এমন একটি কোরআন এমনকি, তার একটি ছোট্ট সূরার মতও সূরা তৈরী করতে। যারাই এ কোরআন সম্পর্কে সন্দেহ ও দিধা-সংকোচে পতিত হয়েছে, এ কোরআনই তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছে, কিন্তু তারা কখনই এর মোকাবিলা করতে পারেনি। তাই কোরআনই বলেছে :

(قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا)

'বলো তাদেরকে! যদি জ্বিন ও মানব জাতি একত্রে সংঘবদ্ধ হয় যে, এ কোরআনের মত একটি কোরআন তৈরী করবে তাহলে তারা অনু প তৈরী করতে পারবেনা, যতই তারা এ কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা ক ক না কেন?' (সূরা : বণী ইস্রাইল আয়াত নং ৮৮)

আল- কোরআন আরো বলছে :

(وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)

'আমি আমার বান্দা (মুহাম্মাদের) প্রতি যা কিছু (কিতাব) অবতীর্ণ করেছি, সে ব্যাপারে যদি তোমাদের মধ্যে সন্দেহ ও সংশয় থেকে থাকে, তাহলে (কম পক্ষে) এর মত একটি (ছোট্ট) সূরা

তৈরী করে নিয়ে এসো এবং আল্লাহকে ছাড়া তোমাদের মধ্যে থেকে এর সাক্ষ্য হিসাবে ডেকে নাও, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও' (সূরাঃ আল- বাকারাহ্ ২৩)।

আমরা বিশ্বাস রাখি যে, কালের আবর্তে আল- কোরআন কখনও পুরাতন হবে না, শুধু তাই নয় বরং এর মু' জিযাহ্ সমৃদ্ধ দিকগুলো দিনদিন আরো স্পষ্ট এবং এর অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুসমূহ বিশ্ববাসীর জন্যে আরো উজ্জল হয়ে দেখা দিবে। ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন :

'মহান আল্লাহ্ কোরআন মজীদকে কোন বিশেষ সময়- কালের জন্যে নির্দিষ্ট করেননি। এ কারণেই কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক দলের কাছেই নতূন বলে পরিগণিত' (বিহা ল আনোয়ার ২য় খঃ পৃঃ নং ২৮০, হাদীস- ৪৪)।

২৬. কোরআন বিকৃত হয়নি :

আমরা বিশ্বাস করি : বর্তমানে যে কোরআন বিশ্ব মুসলমানের হাতে রয়েছে, এটা সেই কোরআন যা বিশ্বনবীর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। তাতে না কোন কিছু সংযোজন হয়েছে আর না তা থেকে কোন কিছু ঘাটতি হয়েছে। ওহী নাযিলের প্রথম থেকেই একদল ওহী লেখক কোরআনের আয়াত অবতীর্ণের পরপরই লিখে রাখতেন। আর মুসলমানদের কর্তব্য ছিল, দিন- রাত তা পাঠ করা। পাঁচ ওয়াক্তের নামাযসমূহে তা পুনঃপুনঃ তিলাওয়াত করা। বিরাট একদল লোক তা স্মরণ রাখতেন ও মুখস্ত করতেন। কোরআনের হাফেজ ও কারীদের একটা বিশেষ মর্যাদা সব সময়ই ইসলামী সমাজে বিদ্যমান ছিল ও আছে। এ কারণগুলো ও অন্যান্য আরও কিছু কারণ ছিল, যে জন্যে আল- কোরআনে সামান্যতম পরিবর্তন আনাও সম্ভব হয়নি। এ ছাড়াও মহান আল্লাহ্ নিজেই পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ কোরআনকে সংরক্ষণ করার দায়- দায়িত্ব নিয়ে রেখেছেন। মহান আল্লাহর এ জিম্মাদারী গ্রহণকরার কারণে কোরআনে পরিবর্তন ও বিচ্যুতি ঘটানো একেবারেই অসম্ভব। এ মর্মে আল্লাহ্ বলেন :

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)

'আমরাই এ কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষণ করব' (সূরা : আল-হিজর, আয়াত নং ৯)।

শিয়া- সুন্নী নির্বিশেষে সমস্ত ওলামা ও গবেষকগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষন করেছেন যে, কোন প্রকার বিকৃতির হাত আজও কোরআনের দিকে বাড়েনি। উভয় মাযহাবেরই মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক কোরআনের তাহরিফ বা বিকৃতির পক্ষে কথা বলেছেন। তারা কয়েকটি হাদীসের প্রেক্ষিতে এ কথা বলেছেন। কিন্তু উভয় মাযহাবেরই বি ওলামাগণ এ দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং উক্ত হাদীসগুলোকে জাল বা কৃত্রিম হাদীস বলে মনে করেন। অথবা, সে বিকৃতি অর্থগত বিকৃতি হতে পারে অর্থাৎ কোরআনের আয়াতের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা কেউ দিয়েছেন। কিংবা কোরআনের মূল পরিভাষার ভুল বিশ্লেষণ করেছেন।

সীমিত চিন্তাশীল এসব লোকেরা - যারা কোরআনের বিকৃতি ঘটেছে বলে বিশ্বাস করে, তাদের এ বাড়াবাড়ি শিয়া ও সুন্নী উভয় পক্ষেরই বড় বড় বি ও খ্যাতনামা ওলামাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত চিন্তাধারা। প্রকৃতপক্ষে এরা শিয়াও নয় সুন্নিও নয়। এরা কোরআনের উপর আঘাত হানে। এদের এ অন্যায় গোঁড়ামীর কারণে আল- কোরআনের উপর নির্ভরতার বিষয়টি প্রশ্নের সন্মুখীন করে তোলা এবং তা শত্রুদের চাপাকলে পানি ঢালারই নামান্তর।

ইতিহাস অধ্যয়ন করে দেখা যায়, কোরআন সংগ্রহ করার বিষয়টি স্বয়ং রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর জীবদ্দশায়ই এক অসাধারণ উদ্যোগ ছিল- মুসলমানদের লিপিবদ্ধ করা, মুখস্ত বা হেফজ করা, পুনঃ পুনঃ পাঠ বা বিশেষতঃ একদল ওহী লেখকের প্রথম থেকে লিপিবদ্ধ করে রাখা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা এ সত্যটি সকলের জন্যেই স্পষ্ট ও পরিস্কার করে দেয় যে, কোরআনে বিকৃতি ঘটাবার ব্যাপারে হস্ত সম্প্রসারণ করা একটি অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এ ছাড়াও সকলের নিকট পরিচিত এ কোরআন ব্যাতীত আর কোন কোরআনের অস্তি ও পরিলক্ষিত হয় না। এ দলিলটি একটি স্পষ্ট প্রমাণ। তা ছাড়া অনুসন্ধান ও গবেষণার দ্বার সবার জন্যেই উন্মুক্ত। কেননা, আজকে আমাদের ঘরে ঘরে, সমস্ত মসজিদসমূহে ও সমস্ত পাঠাগারগুলোতে সব দেশের কোরআন বর্তমান রয়েছে। এমনকি, হাতে লেখা কোরআনগুলো যা বহু শতাব্দীর পূরাতন এবং আমাদের যাদুঘর ও মিউজিয়াম গুলোতে সংরক্ষিত রয়েছে। এ সব কোরআন প্রমাণ করে দেয় যে, বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে প্রচলিত কোরআনটাই সে সব কোরআনেরই অনুরূপ। অতীতে যদি এ বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান করার অবকাশ না থেকে থাকে তাহলে এখন তো সে পথ রূদ্ধ নয় বরং সবার জন্যেই গবেষণার পথ খোলা। সংক্ষিপ্ত গবেষণা দ্বারাই পরিস্কার হয়ে যায় যে "কোরআন বিকৃতির কথাটি" ভি হীন ও অবৈধ। কোরআন নিজেই বলেছে :

(فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)

'আমার সেই বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিন যারা এ কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে, অতঃপর উ মভাবে তার অনুস্মরণ করে' (সূরা : যুমার, আয়াত নং ১৭- ১৮)।

আজকাল আমাদের হাওযায়ে ইলমিয়াসমূহে (দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে) ব্যাপকভাবে কোরআনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষাদান চলছে। এর মধ্যে গু পূর্ণ একটি বিষয় হল : কোরআনে তাহ্রীফ বা বিকৃতি ঘটেনি।

২৭. কোরআন এবং মানুষের পার্থিব ও অধ্যাত্মিক চাহিদা :

আমরা বিশ্বাস করি : মানুষের পার্থিব ও অধ্যাত্মিক জীবন- যাপনের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন, তার মৌলনীতিসমূহ এ কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। সরকার পরিচালনা, রাজনৈতিক বিভিন্ন দিক, অন্যান্য জাতির সাথে সম্পর্ক, সহাবস্থাননীতি, যুদ্ধ ও সন্ধি, বিচার ব্যবস্থা, অর্থনীতি ইত্যাদির বিধি- বিধান ও আইন- কানূন এ কোরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা আমাদের জীবনযাত্রাকে বাঞ্ছিত লক্ষ্যের দিকে পরিচালনার বিষয়টি উরল করে দিয়েছে।আল্লাহ্ বলেন : 'আমরা এ কিতাবকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি- যা সকল বিষয়ের বর্ণনাকারী এবং মুসলমানদের জন্যে হেদায়েত স্বরূপ, রহ্মত ও সুসংবাদ বাহক' (সূরা : আন নাহল আয়াত নং ৮৯)।

এ কারণে আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে যে, ইসলাম কখনও রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি থেকে বিছিন্ন নয় এবং মুসলমানদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দেয় যে, নিজ নিজ যুগের রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত কর ও এ কোরআনের সাহায্যে মহান ইসলামের মহামূল্যবান ঐতিহ্যকে উজ্জিবিত রাখ। আর ইসলামী সমাজকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দান কর যে, সাধারণ মানুষ যেন ন্যায়- ইনসাফ ও সুবিচার লাভ করতে পারে। এমনকি, ন্যায় বিচারের বিষয়টি যেনো বন্ধু ও দুশমন সকলের প্রতি সমভাবে কার্যকর হয়। যেমন :

'হে ঈমানদার লোকেরা! ন্যায়- ইনসাফকে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠা কর। আর কেবলমাত্র খোদার জন্যেই সাক্ষ্য প্রদান কর। যদিও (তোমার সাক্ষ্য) তোমার নিজের অথবা তোমার পিতা- মাতার কিংবা আত্মীয়- স্বজনের ক্ষতির কারণ হয়' (সূরা : আন- নিসা আয়াত নং ১৩৫)।

আল্লাহ্ বলেন : ‘কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এ কাজে উদ্যত না করে যে, তোমরা ন্যায়- ইনসাফের নীতি অবলম্বন করবে না, ন্যায় বিচার কর, যা খোদা ভীতি ও পরহেযগারীর নিকটবর্তী’ (সূরাঃ আল- মায়েদাহ্ আয়াত নং ৮)।

২৮. তিলাওয়াত, চিন্তা- গবেষণা ও অনুশীলন :

আমরা বিশ্বাস করি : কোরআন তিলাওয়াত বা অধ্যয়ন করা শ্রেষ্ঠ ইবাদত। খুব কম ইবাদতই এমন আছে যা এর সম পযার্য়ের হতে পারে। কেননা, ঐশীবাণীর এ অধ্যয়ন ও কোরআনের উপর চিন্তা ভাবনা ও গবেষণাই হচ্ছে মানুষের সৎকর্মের উৎস কেন্দ্র। কোরআন রাসূলকে (সাঃ) উদ্দেশ্য করে বলছে :

‘রাত্রি জাগরণ কর, রাতের কিয়দংশ ব্যতীত, অর্ধ রাত্রি অথবা অর্ধেকের থেকে সামান্য কম কর, অথবা অর্ধেকের চাইতে কিছু বৃদ্ধি কর, আর কোরআনকে মনোযোগ ও সুদর্শিতার সাথে পাঠ কর’ (সূরাঃ আল- মুযযাম্মিল ২- ৪)।

কোরআন সমস্ত মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলছে :‘তোমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব কোরআন পাঠ করো’ (সূরাঃ আল- মুযযাম্মিল ২০)।

কিন্তু যেমনভাবে বলা হয়েছে কোরআন তিলাওয়াত বা অধ্যয়ন করা, কোরআনের অর্থ, বিষয়বস্তু ও তাংপর্য বুঝার জন্যে চিন্তা- ভাবনা ও গবেষণা করতে হবে তেমনিভাবে চিন্তা- ভাবনা ও গবেষনা কোরআনের উপর আমল- অনুশীলনের ক্ষেত্রে ভূমিকা হিসাবে কাজ করবে। কোরআনেই বলা হয়েছে :

‘তারা কি কোরআনকে নিয়ে চিন্তা- ভাবনা করে না? নাকি, তাদের অন্তরে তালা লেগে গেছে?’ (সূরাঃ মুহাম্মাদ আয়াত নং ২৪)।

আল্লাহ্ আরো বলেন : ‘আমরা কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। এমন কেউ আছে কি তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং এর উপর আমল করবে?’ (সূরা : আল- কামার আয়াত নং ১৭)।

আল্লাহ্ আরো বলেন : ‘এটি একটি বরকতপূর্ণ ও কল্যাণময় কিতাব, যা আমি (তোমার প্রতি) অবতীর্ণ করেছি। অতএব এর অনুসরণ করো’ (সূরা : আল- আনআম, আয়াত নং ১৫৫)।

এ জন্যেই যারা শুধুমাত্র কোরআন পাঠ করে ও মুখস্ত করে, কিন্তু এর উপর চিন্তা- ভাবনা ও আমল- অনুশীলন করেনা, তারা যদি ও কোরআনের তিনটি গু পূর্ণ বিষয়ের একটি সম্পাদন করল, অথচ গু পূর্ণ দু’টি আমল হাত ছাড়া করল। তাই তারা বিরাট ক্ষতির শিকার হল।

২৯. বিচ্যুতি বিষয়ক আলোচনা :

আমরা বিশ্বাস করি : সব সময়ই মুসলমানদেরকে কোরআনের আয়াতসমূহের উপর চিন্তা- গবেষণা ও এর উপর আমল করা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার জন্যে এক শ্রেণীর লোক লিপ্ত আছে। এক সময় বনী উমাইয়্যা ও বনী আব্বাসীদের শাসনামলে “কোরআনের বাণীসমূহ আদি ও চিরন্তন নাকি নতূন সৃষ্টি” এ নিয়ে সমাজে একটা বিতর্কের সূচনা হয়েছে, ফলে মুসলমানরা দু’দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের দুশমনে পরিণত হয়েছে এবং এ পথে ব্যাপক খুনাখুনী ও রক্তপাত ঘটেছে। বিঃ দ্রঃ (কোন কোন ইতিহাসে দেখা যায় যে, আব্বাসী খলীফা মা’মুন তার এক বিচারপতির সহযোগিতায় নির্দেশ পাঠাল যে, “যারা কোরআনকে নতূন সৃষ্ঠি বলে বিশ্বাস করবে না তাদেরকে সরকারী পদ থেকে পদচ্যুত করা হবে। আর আদালতে তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না”) । (কোরআন সংগ্রহের ইতিহাস, পৃঃ ২৬০)।

বস্তুতঃপক্ষে এখন আমরা জানি যে, এর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিটি বুঝার জন্যে রক্তপাত ও মানুষ বলিদানের দরকার নেই। কেননা “আল্লাহর বাণীর” উদ্দেশ্য যদি হয় কোরআনের অক্ষর, নকশা, লেখা ও কাগজ তাহলে নিঃশন্দেহে কোরআনের বাণীসমূহ নতুন সৃষ্টি। আর যদি এর উদ্দেশ্য হয় মহান আল্লাহর ান- বি ানের অর্থ ও তাৎপর্য, তাহলে নিঃসন্দেহে কোরআনের বাণীসমূহ আল্লাহর সহজাত চিরন্তন ান (নতুন সৃষ্টি নয়)। কিন্তু ক্ষমতাধর শাসকবর্গ ও জালিম খলিফারা বছরের পর বছর ধরে মুসলমানদেরকে এ বিষয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত রেখেছে। বস্তুতঃ

আজকের এ যুগেও অপশক্তিধর লোকেরা ভিন্ন পন্থায় মুসলমানদেরকে কোরআনের উপর চিন্তা-গবেষণা ও এর উপর আমল করা থেকে বিরত রাখার নানান কৌশল অবলম্বন করছে।

৩০. কোরআনের তফসিরের বিধান :

আমরা বিশ্বাস করি : আল- কোরআনের শব্দসমূহকে প্রচলিত ও আভিধানিক অর্থে প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু যদি কোরআনের আয়াতের অভ্যন্তরে কিংবা এর বাইরে ান- বুদ্ধিগত অথবা বর্ণনাগত কোন আলামত ও নির্দেশ পাওয়া যায় তাহলে অন্য অর্থ করা যেতে পারে। (কিন্তু সন্দেহজনক নিদর্শনাদির উপর ভরসা করা উচিৎ নয় বরং সেগুলোকে পরিহার করাই শ্রেয়। আর কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা ধারণা প্রসূত হওয়া উচিৎ নয়)। যেমন কোরআন বলছে :

'যে ব্যক্তি এ জগতে অন্ধ থাকবে সে পরকালেও অন্ধ ও দৃষ্টি হীন থাকবে' (সূরা : বনী ইস্রাইল, আয়াত নং ৭২)।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এখানে "অন্ধ" এর বাহ্যিকভাবে যে আভিধানিক অর্থ রয়েছে প্রকৃত অর্থ তা নয়। কেননা, অনেক অনেক পূর্ণ্যবান ও পাক পবিত্র লোক এ জগতে অন্ধ ছিলেন ও আছেন। কাজেই এখানে অন্ধের বাহ্যিক অর্থ দৃষ্টিহীন লোকজন নয়। বরং কুটিল আত্মা সম্পন্ন তথা আত্মার দিক থেকে যারা অন্ধ ও পথভ্রষ্ট সে সব লোক। এখানে ান- বুদ্ধি ও নির্দেশে এ ব্যাখ্যাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। অনুরূপভাবে কোরআন, ইসলামের দুশমন- একদল লোক সম্পর্কে বলেছে :'তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। অতএব, তারা কিছুই বুঝে না' (বাকারাহ্ : আয়াত নং ১৭১)।

এ কথা স্পষ্ট যে, এ লোকগুলো বাহ্যিক দিক থেকে বধির, বোবা ও অন্ধ ছিল না বরং এটা তাদের আভ্যন্তরীন বৈশিষ্ট্য। (এ ব্যাখ্যাটি আমরা এখানে এ কারণে করলাম যে, এখানে আমাদের হাতে আলামত বা ান- বুদ্ধিগত নির্দেশ ছিল)। এভাবে কোরআন যখন মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে বলে : 'আল্লাহর দু' হাতই প্রশস্ত' (সূরা : আল- মায়েদাহ্ ৬৪)।

কোরআন আরো বলে : '(হে নূহ্!) তুমি আমাদের চোখের সামনেই নৌকা তৈরী করো' (হুদ : ৩৭)।

উপরোল্লেখিত আয়াত দু' টির অর্থ কখনই আল্লাহর শরীরের চোখ, কান, হাত ইত্যাদি অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের ব্যাপারে নয়। কেননা, প্রত্যেক শরীরেরই অঙ্গ- প্রতঙ্গ থাকে। আর সেগুলোর জন্যে স্থান- কাল ও কারণ থাকে এবং অবশেষে একদিন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এখানে আল্লাহর

“হাত' ” এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সেই পূর্ণাঙ্গ শক্তি, যার ক্ষমতাবলে তিনি সমগ্র জাহানকে নিজের প্রতিপ ি র আওতায় রেখেছেন। আর তাঁর “চক্ষু” এর অর্থ হচ্ছে তাঁর ান- পরি ান- যা সব কিছুর ব্যাপারেই তাঁর রয়েছে।

অতএব উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে, আমরা কখনো চাইনা যে, আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের বিষয় হোক অথবা অন্য কোন ব্যাপার হোক ান- বুদ্ধিগত ও বণর্নাগত আলামত ও নির্দেশকে কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অলক্ষ্যে বাদ যাক। কেননা, জগতের সমস্ত অভি ও বি মহল এ নীতিকে অবলম্বন করেছেন এবং এ নীতি- পদ্ধতিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন : ‘আমরা কোন রাসূলকেই প্রেরণ করিনি; কিন্তু তাদের জাতির ভাষাভাষী লোক ব্যতীত’ (সূরা : ইব্রাহীম, আয়াত নং ৪)।

কিন্তু সে আলামত ও নির্দেশ সন্দেহমুক্ত ও নিশ্চিত হতে হবে, ধারণা প্রসুত নয়।

৩১. মনগড়া তফসিরের বিপদ :

আমরা বিশ্বাস করি : মনগড়া তফসির কোরআন সম্পর্কে বিপদজনক কর্মসূচীগুলোর একটি অন্যতম কর্মসূচী। ইসলামী বর্ণনা মতে এ কাজটি “কবীরাহ্ গুনাহ্” তথা মহা পাপ বলে পরিগণিত এবং আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হবার কারণ। এক হাদীসে আছে যে, মহান আল্লাহ্ বলেন :‘যে ব্যক্তি আমার বাণীকে তার নিজের ইচ্ছা মত ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করে (অর্থাৎ নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা মোতাবেক) সে আমার প্রতি ঈমান আনেনি’ (অসায়েল, ১৮শ খঃ, পৃঃ২৮, হাদীস নং২২)।

এ কথা স্পষ্ট যে, যদি সত্যিকারের ঈমান তার মধ্যে থাকত তাহলে খোদার বাণীকে ঠিক যেভাবে আছে সেভাবেই গ্রহণ করে নিত। তার প্রবৃ ি র কথা মত নিত না। বিখ্যাত অনেক হাদীস গ্রন্থে যেমন : ছহীহ্ তিরমিযি, নাসাঈ ও আবুদাউদ গ্রন্থে এ হাদীসটি রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণিত : ‘যারা কোরআনের বাণী কে নিজেদের ইচ্ছা মোতাবেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে অথবা যে বিষয়ে সে জানেনা তা বলে, সে যেন প্রস্তুত থাকে যে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম’ (রিয়াদের প্রখ্যাত

বি ব্যক্তি জনাব মান্নায়িল খলীল আল কা ান রচিত- কিতাবু মাবাহিছু ফী উ' লুমিল কোরআন পৃঃ ৩০৪)।

মনগড়া তাফসীর করার অর্থ হচ্ছে কোরআনের বাণীকে কোন ব্যক্তির নিজের ইচ্ছা ও বিশ্বাস মত অথবা নিজের দলের চাহিদা ও বিশ্বাস মোতাবেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা এবং তদানুযায়ী খাপ খাইয়ে ও মিলিয়ে দেয়া। অথচ, এ ব্যাপারে কোন আলামত বা নিদর্শন তাদের পক্ষে নেই। প্রকৃত পক্ষে এ ধরনের লোকেরা কোরআনের অনুসারী নয় বরং তারা চায় কোরআনকে তাদের অনুসারী বানাতে। তারা যদি কোরআনের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস পোষণ করত তাহলে কখনোই এমন কাজ করতে পারত না।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি কোরআনের তফসিরের ক্ষেত্রে মনগড়া তফসির করার দরজা খুলে দেয়া হয় তাহলে কোরআন সার্বিকভাবে নির্ভরতা হারিয়ে ফেলবে। আর যে কেউ তখন নিজের ইচ্ছা মত ব্যাখ্যা করা শু করবে এবং সকল বাতিল পন্থীরাই নিজেদের বিশ্বাসের সাথে কোরআনের আয়াত মিলিয়ে নিবে।

অতএব, কোরআনের মনগড়া তফসিরের অর্থ হচ্ছে : আভিধানিক মানদন্ডের খেলাফ, আরবী সাহিত্যের পরিপন্থী, আরবী ভাষাভাষী লোকদের বুঝের বহির্ভুত, অনুমানের সাথে মিলিয়ে দেয়া, বাতিল ও ধারণা প্রসূত, ব্যক্তিগত ও দলগত ইচ্ছানুযায়ী ব্যাখ্যা দান করা, যা দ্বারা কোরআনের অর্থের বিকৃতি ঘটে।

কোরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা দানের নানা রকম শাখা প্রশাখাও রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআনের আয়াতকে বেছে নেয়া। এ অর্থে যে, যেমন শাফায়াত বা সুপারিশের বিষয়, তৌওহীদ বা এক বাদের ক্ষেত্রে ইমামত বা নেতৃে র পর্যায়ে ও অন্যান্য ব্যাপারে কেবলমাত্র সেই সব আয়াতের নিকটই যায় - যা তার লক্ষ্য- উদ্দেশ্যের পথে সহায়ক হয়। আর অন্য যে আয়াতসমূহ তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় কিন্তু অন্য আয়াতের সম্পুরক ও বিশ্লেষক সে আয়াতসমূহকে অলক্ষ্যে বাদ দিয়ে দেয় অথবা সে আয়াতসমূহের প্রতি অমনোযোগ সহকারে পাশ কেটে যায়।

সার কথা হচ্ছে : কোরআনে ব্যবহৃত শব্দসমূহের উপর দৃঢ়ভাবে বসে থাকা এবং ান- বুদ্ধিগত ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগত দলীল প্রমাণ ভি ক আলামত ও নির্দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা, যেমন এক প্রকারের বিকৃতি, তেমনি মনগড়া তফসির তথা ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ ও বিকৃতি হিসাবে পরিগণিত হবে। আর দু' টি পন্থাই কোরআনের মহা মূল্যবান উচ্চ শিক্ষা থেকে দুরে নিক্ষিপ্ত হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। চিন্তা করে দেখুন।

৩২. হাদীস, কোরআন কর্তৃক অনুমোদিত :

আমরা বিশ্বাস করি : কোন ব্যক্তিই একথা বলতে পারে না যে, অর্থাৎ আমাদের জন্যে আল্লাহর কিতাব কোরআনই যথেষ্ট। আর হাদীস ও নবীর সুন্নত, যা তফসির সম্পর্কীত, কোরআনের হকীকত বর্ণনাকারী, নাসেখ ও মানসুখ তথা বাতিলকারী ও বাতিলকৃত আয়াতের সনাক্তকারী এবং সাধারণ ও বিশেষ আয়াতের পার্থক্যকারী অথবা ইসলামের মৌলিক শাখা- প্রশাখার শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত, তা অলক্ষ্যে উপেক্ষা করা যায় না। কেননা, কোরআনের আয়াতই রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর আদর্শ- চরিত্র, তাঁর বলা- বক্তব্য ও তাঁর কৃতকর্মকে মুসলমানদের জন্যে হুজ্জাত তথা দলীল বলে গণনা করেছে এবং সে হাদীসসমূহকে ইসলাম জানা ও বুঝার এবং ইসলামী হুকুম- আহকাম নির্ণয় করার উৎস বলে ঘোষণা করেছে। কোরআন বলেছে :

'যা কিছু রাসূলে আকরাম (সাঃ) তোমাদের জন্যে নিয়ে এসেছেন (ও তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন) তা গ্রহণ কর। (আমল কর) এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করো' (সূরা : আল হাশর আয়াত নং৭)।

কোরআন আরো বলেছে :

'ঈমানদার নর- নারী কারোই অধিকার নেই যে, যখন আল্লাহ্ ও রাসূল কোন বিষয়ে জ রী মনে করেন ও নির্দেশ দান করেন তখন তা তারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ রাসূলের কথা অমান্য করলো সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হলো' (সূরা : আল আহযাব, আয়াতনং ৩৬)।

‘যারা রাসূলের হাদীসের প্রতি তোয়াক্কাহীন, প্রকৃতপক্ষে তারা কোরআনকেই উপেক্ষা করছে।

কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, রাসূলের হাদীস অবশ্যই নির্ভরযোগ্য সূত্রে স্থির হতে হবে। যে কোন বক্তব্যই, যে কোন লোক রাসূলের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দিলেই তা গ্রহণ করা যেতে পারে না। হযরত আলী (আঃ) একবার এক বক্তৃতায় এরূপ বলেন :

‘রাসূলের জীবদ্দশায়ই তার নামে মিথ্যা (হাদীস) বাঁধা হয়েছে, অবশেষে রাসূল (সঃ) একদিন দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছিলেন। তাতে তিনি বললেন : যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা (হাদীস) ইচ্ছা করে বাঁধবে, সে যেন প্রস্তুত থাকে যে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম’ (নাহজুল বালাগাহ, খোৎবা নং২১০)।

অনুরূপ অর্থের একটি হাদীস ছহীহ্ বোখারীতেও আছে। (দেখুন, ছহীহ্ বোখারী, ১ম খঃ, পৃঃ ২৮, বাবে ইসমুমান কাজিবা আলান্নাবী (সাঃ))।

৩৩. আহলে বাইতের ইমামগণের হাদীস :

আমরা আরো বিশ্বাস করি : রাসূলের আহলে বাইতের ইমামগণের হাদীসসমূহ ও রাসূলের নির্দেশমতে মেনে চলা অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা,

প্রথমতঃ শিয়া- সুন্নী উভয় ফিরকার অধিকাংশ বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থসমূহে “হাদীসে মোতাওয়াতের' ' রয়েছে যা এ কথারই বিশ্লেষণ করেছে। ছহীহ্ তিরমিযিতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন : ‘হে লোক সকল! আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরে থাক তাহলে কখনই পথভ্রষ্ট- গোমরাহ্ হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব (আল- কোরআন) ও আমার আহলে বাইতের বংশধারা’(ছহীহ্ তিরমিযি, ৫ম খঃ, পৃঃ :৬৬২, বাবে মানাকিবে আহলে বাইতিন্নাবী (সঃ), হাদীস নং ৩৭৮৬)।

এ হাদীসের বহু সংখ্যক সনদ ইমামতের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

দ্বিতীয়ত : আহলে বাইতের ইমামগণ নিজেদের সমস্ত হাদীসই রাসূলে আকরাম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন : আমরা যা কিছু বলি তা আমাদের পূর্বপু ষদের মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) থেকে আমাদের নিকট পৌছিয়েছে।

জী হ্যাঁ; হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) মুসলমানদের ভবিষ্যত ও তাদের সমস্যাবলী ভালভাবেই বুঝতে পারছিলেন এবং তাদের এ অসংখ্য সমস্যা সমাধানের পথ পৃথিবীর মহাপ্রলয় অবধি কোরআন ও আহলে বাইতের অনুসরণের মধ্যে নিহিত আছে বলে ঘোষণা করেছেন।

যে হাদীসটি এত গু ে র দাবীদার এবং যার মধ্যে এত সব বিষয়াদি শামিল আর যা এত সনদ সমৃদ্ধ তা কি উপেক্ষা করা যেতে পারে? আর খুব সহজেই কি তার পাশ কেটে চলে যাওয়া যায়? এ কারণেই আমরা বিশ্বাস করি : যদি এ ব্যাপারটিতে অধিকতর গু আরোপ করা হত তাহলে আজকের মুসলমানরা আকীদা- বিশ্বাসের সব ক্ষেত্রে, কোরআনের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণের ময়দানে ও ফীকাহ্ শাস্ত্রের মাসআলা- মাসায়েলের জগতে যে সমস্ত সমস্যার সন্মুখীন, তার কিছুই দেখা দিত না।

চতুর্থ অধ্যায়

কিয়ামত ও পূনর্জীবন

৩৪. পরকাল ব্যতীত জীবন অর্থহীন :

আমরা বিশ্বাস করি : সমস্ত মানুষ মৃত্যুর পর একদিন পুনরায় জীবিত হবে। আর তাদের কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। সৎ কর্মশীল ও নেক্কার লোকেরা বেহেশ্তের মধ্যে চিরকালের জন্যে স্থান লাভ করবে এবং অসৎ কর্মশীল ও পাপী লোকেরা নরকে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ্ বলেন : 'আল্লাহ্ সে মহান স া যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। নিঃসন্দেহে তোমাদের সকলকে শেষ বিচার দিবসে অবশ্যই সমবেত করা হবে, যে দিনের ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই' (সূরা : আন-নিসা, আয়াত নং ৮৭)।

আল্লাহ্ আরো বলেন :

'কিন্তু যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করবে ও পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকারের ভি তে বিবেচনা করবে, নিঃসন্দেহে তার স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। আর যে ব্যক্তি তার প্রভূর বিচার আদালতকে ভয় করে চলবে এবং নিজের আত্মাকে প্রবৃ ি র চাহিদা থেকে নিবৃ রাখবে, নিঃসন্দেহে তার বাসস্থান হচ্ছে বেহেশ্ত' (সূরা : আন-নাযিয়াত, আয়াত নং ৩৭-৪১)।

আমরা বিশ্বাস করি : এ পৃথিবীটা প্রকৃত পক্ষে একটা পুল বা সেতু স্বরূপ। সমস্ত মানুষকেই তা অতিক্রম করে যেতে হবে এবং নিজের চির আবাসে গিয়ে পৌঁছতে হবে। অন্য কথায়, এ পৃথিবীকে একটা বিদ্যাপীঠ বলা যেতে পারে। অথবা এটা একটা ব্যবসা কেন্দ্র কিংবা এটা একটা কৃষিক্ষেত্র, আর বাসস্থান অন্যত্র।

হযরত আলী (আঃ) এ পৃথিবী সম্পর্কে বলেন :

‘পৃথিবী সত্য ও সত্যবাদীতার স্থান সে ব্যক্তির জন্যে যে এর সাথে সত্যবাদীতার সাথে কাজ করে দুনিয়া একটি অমুখাপেক্ষীতার স্থান, যে রসদ সঞ্চয় করে। এ জগৎ একটি জাগ্রত ও শিক্ষা গ্রহণ করার স্থান সে ব্যক্তির জন্যে যে এর থেকে শিক্ষা নিতে চায়। এটা খোদার বন্ধুদের জন্যে মসজিদ; আল্লাহর ফেরেশতাদের নামাযের স্থান, আল্লাহর অহী বা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণের স্থান ও খোদার অলি আওলিয়াদের ব্যবসাকেন্দ্র’ (নাহজুল বালাগাহ্, কালিমাতি কেসার নং ১৩১)।

৩৫. পরকালের দলীল- প্রমাণ সুস্পষ্ট :

আমরা বিশ্বাস করি : কিয়ামত বা পরকালের দলীল- প্রমাণ সুস্পষ্ট। কেননা, প্রথমতঃ এ পৃথিবীর জীবনই নির্দেশ করছে যে, মানব সৃষ্টির চুড়ান্ত ও মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এ পৃথিবীর জীবন হতে পারে না। মানুষ কিছু দিনের জন্যে এখানে আসবে, তারপর অসংখ্য সমস্যা বিজড়িত জীবন যাপন করবে, এরপর সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটবে, আর মানুষ অনস্তিে র রাজ্যে বিলিন হয়ে যাবে। আল্লাহ্ বলেন :

‘তোমরা কি ভেবে নিয়েছ যে, আমরা তোমাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি করেছি, আরতোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরে আসতে হবে না?’ (আল- মু' মিনুন : ১১৫)।

এ আয়াতটি এ কথারই ইংগিত করছে যে, যদি পরকালের ব্যাপারই না থেকে থাকে তাহলে তো এ দুনিয়ার জীবন একটা নিছক পুতুল খেলা মাত্র।দ্বিতীয়ত : আল্লাহর আদল বা ন্যায়- ইনসাফের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে যে, সৎ কর্মশীল ও অসৎকর্মশীল লোকেরা যারা প্রায়শই এ জগতে একই কাতারে সারিবদ্ধ হয় আবার কখনো অসৎকর্মশীল লোকেরা এগিয়ে চলে যায়, তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের পরিণতি ভোগ করবে। আল্লাহ্ বলেন :

‘যারা পাপ- অপরাধে অপরাধী তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা তাদেরকে সে সমস্তলোকদের সমপর্যায়ের বলে বিবেচনা করব- যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্মগুলো

সম্পাদনকরেছে- যার ফলে তাদের জীবন ও মরণ সমভাবে হবে? তাদের এ ফয়সালা কতোইনা মন্দ!' (সূরা : আল- জাছিয়াহ, আয়াত নং ২১)।

তৃতীয়ত : আল্লাহর অনন্ত- অসীম দয়ার অপরিহার্য দাবী হচ্ছে যে, তাঁর অনুগ্রহ ও নেয়ামতসমূহ মানুষের মৃত্যুর কারণে তার থেকে বিছিন্ন হয়ে যাবে না। যোগ্য ও প্রতিভাবান লোকদের পর্যায়ক্রমিক পূর্ণতা লাভ যথারীতি অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ্ বলেন : 'আল্লাহ্ অনুগ্রহ ও দয়া করাকে নিজের প্রতি নিজে কর্তব্য কাজ করে নিয়েছেন। আর তোমাদের সকলকে শেষ বিচার বা কেয়ামতের দিন অবশ্যই সমবেত করবেন, যে দিনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই'(সূরা : আল আনআ' ম আয়াত নং ১২)।

পরকাল সম্পর্কে যারা সন্দেহ পোষণ করে কোরআন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছে : আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার ব্যাপারে কি করে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন? অথচ তোমাদেরকে প্রথম বারে সৃষ্টিও তিনিই করেছেন। আবার তিনি তোমাকে পুনরায় জীবন দান করবেন। আল্লাহ্ বলেন :

'আমরা কি প্রথমবারের সৃষ্টির সময় অপারগ ছিলাম (যে, পরকালে আবার সৃষ্টি করতে পারবো না?) কিন্তু তারা (এ স্পষ্ট দলীল- প্রমাণ থাকার পর ও) পরকালে নতুন করে সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষন করছে'। (কাফ : ১৫)।

আল্লাহ্ বলেন

'সে আমাদের ব্যাপারে একটি উদাহরণ উপস্থাপন করলো। কিন্তু সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে গেল ও বললো : এ পঁচা- গলা হাড়গুলোকে কে জীবিত করবে? তুমি বলে দাও! সে সওাই (পুনরায় জীবিত করবেন) যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর তিনি সমস্ত সৃষ্টি সম্পর্কেই সম্যক অবগত আছেন' (ইয়াসীন : (৭৮- ৭৯)।

এছাড়া মানুষের সৃষ্টি কি আকাশ- মন্ডল ও ভূ- মন্ডলের সৃষ্টির চেয়ে আরো অধিকতর গু ে র দাবীদার? যিনি এ বিরাট- বিশাল সৃষ্টি জগৎকে এত সব বিস্ময়কর ভাবে সৃষ্টি করেছেন, তিনি মৃত মানুষকে জীবিত করার ক্ষমতাও রাখেন।

আল্লাহ্ বলেন :

‘তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্ এ আসমান সমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, আর এ গুলো সৃষ্টির কারণে অপারগ ও ক্লান্ত হননি? তিনি মৃত মানুষকে আবার জীবিত করতেও সক্ষম। হ্যাঁ; তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান’ (আল- আহকাফ : ৩৩)।

৩৬. শারীরিক পরকাল :

আমরা বিশ্বাস করি : শুধুমাত্র মানুষের আত্মাই নয় বরং আত্মা ও দেহ একসংগে পরকালে আল্লাহর দরগাহে প্রত্যাবর্তন করবে এবং নতুন জীবন লাভ করবে। কেননা, এ জগতে যা- কিছু করেছে, এ দেহ ও আত্মাই ছিল। সুতরাং পুরস্কার হোক আর শাস্তি হোক এ দুটোকেই ভোগ করা উচিৎ।

কোরআন মজীদে পরকাল সম্পর্কিত আয়াতসমূহের অধিকাংশ আয়াতেই স্ব- শরীরে পুন থানের কথা ইংগিত করা হয়েছে এবং বিরোধীদের আশ্চর্যজনক কথাগুলোর মোকাবেলায় এভাবে বলছে যে, তারা বলতো : “এ পচাঁ- গলা হাড়গুলো কিভাবে আবার পূনর্জীবন লাভ করবে?” এর জবাবে কোরআন বলে :‘তুমি বলে দাও! যে সওা প্রথমবার মাটি থেকে এ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি পুনরায় জীবিত করতেও সক্ষম’ (ইয়াসীন : ৭৯)।

কোরআন আরো বলে :

‘মানুষ কি মনে করে আমরা তাদের (পচাঁ- গলা) হাড়গুলোকে একত্রিত (করে তাকে জীবিত) করব না? হ্যাঁ; আমরা সক্ষম; এমনকি তাদের আঙ্গুলের দাগগুলোকে পর্যন্ত একত্রিত করে পূর্বের ন্যায় ঠিক করবো’ (আল কিয়ামাহ্ : ৩- ৪)।

এ আয়াতটি ও এ জাতীয় অন্যান্য আয়াতসমূহ সমস্তই স্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করছে যে, পরকালে পুন থান স্বশরীরেই অনুষ্ঠিত হবে।

এ ছাড়া, যে সমস্ত আয়াত এ কথা বলে যে, তোমাদেরকে তোমাদের কবর থেকে জাগ্রত করা হবে। এ আয়াতসমূহও পরকালে স্বশরীরে উত্থাপনের বিষয়টিকে পরিষ্কার করে দেয়।

বস্তুতঃ পরকাল সম্পর্কিত অধিকাংশ আয়াতই আত্মা ও দেহের একত্রে উত্থানের প্রতি ইংগিত করছে।

৩৭. মৃত্যুর পর আশ্চর্যজনক এক জগৎ :

আমরা বিশ্বাস করিঃ মৃত্যুর পরবর্তী জগতে (আলমে বারযাখে), মহা প্রলয় বা কেয়ামতেরসময়ে, বেহেশ্ত ও দোযখের রাজ্যে যা কিছু ঘটবে তা আমরা এ সীমিত পৃথিবীতে যা কিছু জানতে পারছি তার থেকে অনেক অনেক উচ্চতর। আল্লাহ্ বলেন :

'কারো জানা নেই যে, এরূপ (পূণ্যবান) লোকদের জন্যে নয়ন জুড়ানো জিনিসপত্র (আল্লাহর) অদৃশ্য ভান্ডারে মওজুদ রয়েছে' (সূরা : আস- সিজদাহ, আয়াত নং ১৭)।

রাসূল (সাঃ) এর একটি বিখ্যাত হাদীস আছে, তিনি বলেন :

'আল্লাহ্ বলেন : আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্যে এমন সব নেয়ামতসমূহ আয়োজন করে রেখেছি- যা কোন চক্ষু দেখতে পায়নি, কোন কান শুনতে পায়নি আর কোন মানুষের অন্তরে এমন কথা স্মরণেও আসেনি' (বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ যেমন, বোখারি ও মুসলিম এবং খ্যাতনামা মুফাস্সিরগণ যেমন, তাবারসী, আলুসী ও কোরতবী নিজ নিজ গ্রন্থাবলীতে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন)।

আসলে আমরা এ পৃথিবীতে সে ভ্রূণের ন্যায়- যা মাতৃগর্ভের সীমিত পরিসরে থাকে। যদি ধরে নেয়া হয় যে, মাতৃগর্ভের সে ভ্রূণের ান- বুদ্ধি আছে, তাহলেও তা মাতৃগর্ভের বহির্জগতে যা কিছু আছে যেমন, উজ্জল চন্দ্র, সূর্য, শীতল বায়ুপ্রবাহ, সুশোভিত ফুলের দৃশ্য, সমূদ্রের ঢেউ- তরঙ্গের তর্জন- গর্জন ইত্যাদি অনুভব করতে পারছে না। ঠিক তেমনিভাবে, এ পৃথিবীটাও পরকালের তুলনায় সে মাতৃগর্ভের ভ্রূণের মত। ভেবে দেখুন।

৩৮. কিয়ামত ও আমলনামা :

আমরা বিশ্বাস করি : কিয়ামত বা শেষ বিচারের দিন আমাদের এ জগতের কৃতকর্মের নথিপত্র বা প্রতিবেদন আমাদের হাতে দেয়া হবে। পূর্ণ্যবান লোকেরা তাদের ডান হাতে এবং পাপি লোকেরা তাদের বাম হাতে নিজেদের কৃতকর্মের আমলনামা পাবে। সৎকর্মশীল লোকেরা তাদের আমলনামা প্রত্যক্ষ্য করে খুবই আনন্দিত ও পুলকিত হবে আর অসৎকর্মশীল পাপি- অপরাধীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে। আল্লাহ্ বলেন :

'যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে সে তো (আনন্দে পুলকিত হয়ে চিৎকার করে) বলবে (হে হাশর বাসীরা)এ নাও আমার আমলনামা, পাঠ করে দেখ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি আমার হিসাব- নিকাশ পর্যন্ত পৌঁছবো। আর সে একটা সন্তোষজনক পরিবেশে থাকবে। সে উচ্চতর স্বর্গে অবস্থান করবে- যার ফলসূমহ তার সামনেঝুঁকে আসবে। (তাকে বলা হবে) আনন্দ ভরে খাও এবং পান কর। এ হচ্ছে তোমার সে কাজের বিনিময়- যা তুমি পূর্বে দুনিয়াতে আঞ্জাম দিয়েছ। কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে (অতীব আক্ষেপ করে বলবে) হায়! যদি আমার আমলনামা আমাকে দেয়াই না হত, তাহলে কতোইনা ভাল হতো' (আল- হক্কা : ১৯- ২৫)।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমলনামা কিরূপ? তা কিভাবে লেখা হবে? যে ব্যাপারে কারো অস্বীকার করার জো নেই; তার সঠিক নীতিমালা আমাদের নিকট স্পষ্ট নয়। এর আগেও আমরা ইশারা করেছি যে, এর বিস্তারিত অনুধাবন করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সামগ্রিক দিকটার অবগতি সম্ভব ও অস্বীকার করার উপায় নেই।

৩৯. কিয়ামত দিনের সাক্ষী :

আমরা বিশ্বাস করি : কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ নিজেই আমাদের সমস্ত কৃতকর্মের সাক্ষী থাকার পরও আমাদের কাজ- কর্মগুলোর সাক্ষী গ্রহণ করবেন। আমাদের হাত- পা গুলো এমনকি, আমাদের শরীরের চামড়াগুলোও আমাদের কর্মধারার সাক্ষ্য প্রদান করবে। যে ভূ-

পৃষ্টে আমরা জীবন- যাপন করতাম এবং আরো অনেক কিছুই আমাদের কাজ- কর্মের সাক্ষী প্রদান করবে।

আল্লাহ্ বলেন : 'আজ (কিয়ামতের দিন) আমরা তাদের মুখে সীল- মোহর লাগিয়ে দিবো, তাদের হাতগুলো আমাদের সাথে কথা বলবে আর তাদের পা গুলো তারা যা- যা কাজ করেছে তার সাক্ষ্য দিবে' (ইয়া- সীন : আয়াত নং ৬৫)।

আল্লাহ্ বলেন : 'তারা তাদের শরীরের চামড়া গুলোকে বলবে, কেন আমাদের বি দ্ধে সাক্ষী প্রদান করলে? জবাবে বলবে, সে মহান আল্লাহ্ যিনি প্রত্যেক সৃষ্টিকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন তিনিই আমাদের কে বাকশক্তি দান করেছেন (এবং তিনিই এ ভেদ ফাঁস করার নির্দেশ দিয়েছেন) ফুচ্ছিলাত : আয়াত নং ২১।

আল্লাহ্ আরো বলেন :

'সে দিন যমীন তার সমস্ত সংবাদ প্রকাশ করে দেবে। কেননা, তোমার প্রভূ তাকে অহী তথা প্রত্যাদেশ করেছেন। (আর তাকে এ দায়ি পালন করতে বলেছেন' (সূরা : যিলযাল, আয়াত নং ৪- ৫)।

৪০. পুলছিরাত ও আমলের পরিমাপ :

আমরা বিশ্বাস করি : কেয়ামতে "পুলছিরাত" ও "মীযান" এর অস্তি আছে। পুলছিরাত এমন একটি সেতু যা জাহান্নামের উপর সংস্থাপন করা হয়েছে। আর প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ঐ পুলের উপর দিয়ে অতিক্রম করে যেতে হবে। হ্যাঁ; বেহেশ্তের পথও জাহান্নামের উপর দিয়েই অতিক্রম করে গেছে। আল্লাহ্ বলেন :

'তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নেই- যাকে এ (পুলছিরাত) অতিক্রম করতে হবে না। অর্থাৎ প্রত্যেককে অবশ্যই এ পুলছিরাত অতিক্রম করতে হবে। আর এটা তোমার প্রভূর অনিবার্য ও অলংঘনীয় নির্দেশ যা অবশ্যম্ভাবীরূপে কার্যকর হবে। অতঃপর, আমরা সে সমস্ত লোকদেরকে মুক্তি ও নাজাতদান করব- যারা তাকওয়া ও পরহেযগারীর নীতি অবলম্বন করেছে। আর

অনাচারী- জালিমদেরকে আর্ৗ সমর্পণ ও নতজানু অবস্থায় এতে (জাহান্নামে) ছেড়ে দেব' (সূরা : মারইয়াম আয়াত নং ৭১- ৭২)।

এ পুলছিরাত অতিক্রম করা এক বিপদজনক ব্যাপার! আমলের উপর নির্ভর করে এ পুলছিরাত কিভাবে পার হবে, এ পর্যায়ে একটি বিখ্যাত হাদীস আছে : 'কেউ কেউ বিদ্যুৎ বেগে এ পুলছিরাত অতিক্রম করবে, কেউ কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার ন্যায়, কেউ কেউ হামাগুড়ি দিয়ে, কেউ কেউ পদব্রীজে চলা লোকদের মতো আবার কেউ কেউ ঝুলন্ত অবস্থায় পার হবে, তাতে দোযখের আগুন তাদের কিছু কিছু জ্বালাবে আর কিছু কিছু ছেড়ে দেবে'।

এ হাদীসটি সামান্য পার্থক্য সহকারে শিয়া ও সুন্নী উভয় মাযহাবেরই বিখ্যাত বিভিন্ন হাদী গ্রন্থে ' লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমনঃ কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ৩৯০৩৬, কোরতুবী, ৬ষ্ঠ খঃ, পৃঃ৪৭৫, সূরা : মারইয়ামের ৭১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ছদূক তাঁর আমালী" গ্রন্থে ইমাম জা' ফর ছাদিক (আঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, ছহীহ্ বোখারী ৮ম খঃ, পৃঃ ১৪৬, "আছছিরাতু জাসারা জাহান্নাম" শিরোনাম।

মিযান : নাম থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, মিযান হচ্ছে মানুষের আমল- অনুশীলনের পরিমাপের মানদন্ড। হ্যাঁ; কিয়ামতের দিন আমাদের কাজকর্মগুলোর পরিমাপ করা হবে এবং তার ওজন ও পরিণতি সবকিছু সুস্পষ্ট করে দেয়া হবে।

আল্লাহ্ বলেন :

'আর আমরা কেয়ামতের দিন ন্যায়- ইনসাফের মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করব। সে দিন কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না। এমনকি, একটি সরিষা দানা পরিমানও যদি (পাপ অথবা পূর্ণ) থেকে থাকে তাহলে সেটিকে উপস্থাপন করব ও তার প্রতিদান দেব। আর যথাযথ হিসাবকারী হিসাবে আমিই যতেষ্ট' (আল আম্বিয়া : ৪৯)।

আল্লাহ্ আরো বলেন :

‘সেদিন যার নেকির পাল্লা ভারী হবে সে সন্তোষজনক এক সুখকর বাসস্থানে অবস্থান করবে আর যাদের নেক আমলের পাল্লা হালকা হবে, জাহান্নামের অতল গহবরে হবে তার বাসস্থান’ (আল- কারিয়াহ্ : ৬- ৯)।

হ্যাঁ; এটাই আমাদের আকীদা- বিশ্বাস যে, পরকালে মুক্তি ও পরিত্রাণ মানুষের কর্মের উপর ভি করে হবে। আশা- ভরশা সব আমলের ভি তে চুড়ান্ত হবে। বস্তুতঃ আত্মার পবিত্রতা ও তাকওয়া- পরহেযগারী ব্যতীত কোন কিছুর আশা করা যায় না। এ ছিল “পুলছিরাত” ও “মিযান” সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও মোটামুটি আমাদের বক্তব্য ও বিশ্বাস। এর বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অবস্থার কথা আমাদের জানা নেই। আগেই বলেছি পরকালের বিষয়টি দুনিয়ার তুলনায় অনেক বিরাট- বিশাল ও উচ্চ ব্যাপার। এর সবকিছু উপলব্ধি করা আমাদের মত পার্থিব নানান ঝামেলায় ব্যস্তলোকদের পক্ষে অসম্ভব।

৪১. রোয হাশরে শাফায়া’ত :

আমরা বিশ্বাস করি : শেষ বিচারের দিন নবী- রাসূলগণ, মা' সুম (নিস্পাপ) ইমামগণ ও অলী- আওলিয়াগণ আল্লাহর অনুমতিক্রমে কোন কোন পাপী- গুনাহগারের জন্যে শাফায়া’ত বা সুপারিশ করবেন এবং তাদেরকে ক্ষমা প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কিন্তু আমাদেরকে এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এ সুপারিশ বা শাফায়া’ত শুধুমাত্র এই ব্যক্তির ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও অলী- আওলিয়াদের সাথে যোগ সম্পর্ক ছিন্ন করে না। সুতরাং শাফায়া’ত শর্তহীন নয়। আর সে শর্তও হচ্ছে নিজেদের আমল- আখলাক ও নিয়্যতের পবিত্রতার মাধ্যমে অলী- আওলিয়াদের সাথে যোগ- সম্পর্ক বজায় রাখা। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

‘তারা সে সমস্ত লোক ব্যতীত অন্য কারও জন্যে শুপারিশ করবেন না- যাদের জন্যে সুপারিশ করার ব্যাপারে আল্লাহ্ রাজী থাকবেন’ (আল- আম্বীয়া : ২৮)।

আগেও যেমন ইশারা করেছি, “শাফায়া’ত” মানুষকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার একটা পন্থা ও পাপ কর্মে লিপ্ত হওয়ার পথে এক প্রকারের বাঁধা। আর অলী- আওলিয়াদের সাথে সম্পূর্ণরূপে

সর্ম্পক ছিন্ন করার ক্ষেত্রে লোকদেরকে বলে যে, যদি গুনাহ্ ও পাপের কাজে লিপ্ত থেকে থাক তাহলে এখানেই থেমে যাও এবং পাপ কাজ ত্যাগ করে ফিরে এসো। এর অধিক পাপ আর করো না।

নিঃসন্দেহে শাফায়া'তের ময়দানে সর্বোচ্চ স্থান হচ্ছে বিশ্বনবী (সাঃ) এর। তাঁর পরে পর্যায়ক্রমে সুপারিশ করার মর্যাদা হচ্ছে অন্যান্য নবী- রাসূল ও মা'সুম ইমামগণের। এমনকি, আলেমগণ, শহীদগণ ও পরিপূর্ণ ঈমানদার লোকেরা যাঁরা কামালিয়াত ও আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। আরো এগিয়ে গিয়ে স্বয়ং আল- কোরআন এবং সৎকর্মসমূহও কোন কোন লোকের জন্যে মহান আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে। ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ) বলেন :

'পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, পরকালে তার মহানবী (সাঃ) এর সুপারিশের দরকার হবে না' (বিহারুল আনোয়ার ৮ম খঃ পৃঃ৪১)।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন : 'রোয হাশরে সুপারিশকারীদের সংখ্যা পাঁচ : আল- কোরআন, সেলেয়ে রেহেম বা আত্মীয়তার সম্পর্ক সংরক্ষণ, আমানত বা গচ্ছিত সম্পদ, তোমাদের নবী ও তোমাদের নবীর আহলে বাইত তথা নবীর (মাছুম) বংশধর' (কানযুল ওম্মাল, হাদীস নং ৩৯০৪১, খঃ- ১৪, পৃঃ- ৩৯০)।

ইমাম জা'ফর সাদিক (আঃ) আরো বলেন : 'হাশরের দিন মহান আল্লাহ "আলেম"ও "আবেদগণকে" (বিশেষভাবে) অভিষিক্ত করবেন। তাঁরা যখন মহান আল্লাহর দরবারে দন্ডয়মান হবেন তখন "আবেদ"কে তথা ইবাদতকারীকে বলা হবে : তোমরা বেহেশ্তে চলে যাও। আর "আলেমদেরকে" বলা হবে : তোমরা দাঁড়াও এবং লোকদেরকে যে সুশিক্ষা দান করেছ (সে সুবাদে তোমাদেরকে মর্যাদা দেয়া হল) এখন তাদের জন্যে সুপারিশ করো' (বিহারুল আনোয়ার, ৮ম খঃ, পৃঃ নং ৬৬)।

এ হাদীসটিও শাফায়া'ত ও সুপারিশের পক্ষে একটা দা ণ দলীল।

৪২. বারযাখের জগৎ :

আমরা বিশ্বাস করি : এ পৃথিবীর জীবন ও রোজ হাশরের মহা সম্মেলনের মাঝে মধ্যবর্তী এ সময়ের জন্যে আরেকটি জগৎ আছে- যার নাম হচ্ছে : আলমে "বারযাখ" সমস্ত মানুষের আত্মাসমূহ এ পৃথিবীতে মৃত্যু বরণ করার পর থেকে হাশরের মাঠের মহা সম্মেলনে সমবেত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে জগতে অবস্থান করবে।

আল্লাহ্ বলেন : "তাদের মৃত্যুর পশ্চাতে রয়েছে এক "বারযাখ" কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত (সময় কালের জন্য)'(সূরা : আল মু' মিনূন, আয়াত নং১০০)।

অবশ্য এ বারযাখের জগতের বিস্তারিত বিষয়গুলো সম্পর্কে খুব একটা বেশী আমাদের জানা নেই। আর জানা সম্ভব ও নয়। এতটুকুন জানি যে, নেক ও সৎকর্মশীল লোকদের আত্মাসমূহ - যা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, তা সে জগতে অসংখ্য- অগণিত নেয়ামতসমূহ উপভোগ করবে ও সুখ স্বাচ্ছন্দের জীবন যাপন করবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

'কখনো এমনটি চিন্তা করো না যে, যারা আল্লাহর পথে আত্মাহুতি দিয়েছে তারা মরে গেছে। বরং তারা জীবিত আছে। তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তারা নানা রকম রিযিক ও নেয়ামত লাভ করছে' (সূরা : আলে ইমরান, আয়াত নং ১৬৭)।

অপর পক্ষে, খোদাদ্রোহী জালিম ও তাদের সহযোগীরা সে বারযাখের জগতে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। যেমন ফিরাউন ও তার সহযোগীদের সম্পর্কে আল কোরআনে বলা হয়েছে :

'প্রতিদিন সকাল- সন্ধা তাদেরকে (বারযাখের জগতে) দোযখের আগুনের শাস্তি প্রদান করা হবে। আর যেদিন কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে (সে দিন বলা হবে) ফেরাউনের বংশধরকে কঠিনতর শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করাও' (আল মু' মিন : ৪৬)।

কিন্তু তৃতীয় যে দলটির পাপ- অপরাধ কম, তারা এ শাস্তিভোগ্য দলেরও অন্তর্ভূক্ত হবে না আর সুখ উপভোগ্য দলের মধ্যে ও শামিল হবে না। মনে হয় যেন তারা বারযাখের জগতে, ঘুমিয়ে থাকার মত অচেতন থাকবে এবং কিয়ামতের দিন জেগে উঠবে। এদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন :

‘আর যেদিন কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে সেদিন অপরাধীরা কসম করে বলবে যে, তারা এক মুহূর্তের বেশী (বারযাখ জগতে) অবস্থান করেনি....। কিন্তু যাদেরকে ান ও ঈমান প্রদান করা হয়েছে তারা (সে সমস্ত অপরাধীর উদ্দেশ্য) বলবে : তোমরা মহান আল্লাহরই নির্দেশে বারযাখের জগতে অবস্থান করছিলে। এখন হাশরের পুনর্জীবিত হওয়ার দিন। কিন্তু তোমরা তা জানো না’ (সূরা : আর- রোম আয়াত নং ৫৫- ৫৬)।

এ পর্যায়ে রাসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন : ‘কবর হচ্ছে জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান অথবা জাহান্নামের গভীর গর্তগুলোর মধ্যে একটি গর্ত। (ছহীহ্ তিরমিযি, ৪র্থ খঃ, “কিতাবু ছিফাতুল কেয়ামাহ্"শিরোনাম, ২৬ অধ্যায়, হাদীস নং ২৪৬০, বিহারূল আনোয়ার, ৬ষ্ঠ খঃ, পৃঃ ২১৪, ও ২১৮, আমী ল মু' মিনীন আলী (আঃ) ও ইমাম আলী ইবনিল হোসাইন (যয়নুল আবেদীন) উভয় সূত্র থেকে পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৪৩. বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক প্রতিদান :

আমরা বিশ্বাস করি : শেষ বিচারের দিন মানুষের কৃতকর্মের যে প্রতিদান দেয়া হবে তার মধ্যে বৈসয়িক প্রতিদানও রয়েছে এবং আধ্যাত্মিক প্রতিদানও রয়েছে। কেননা, কিয়ামতের পুন থান শারীরিক ও আত্মিক দু’ভাবেই হবে। কোরআন ও হাদীসে বেহেশ্তের বাগানসমূহ সম্পর্কে এভাবে বলা হয়েছে :অর্থাৎ ‘বেহেশতের বাগানসমূহ এমন যে, তার (বৃক্ষের) তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ঝর্ণা ধারা’ (সূরা : আত- তাওবাহ্ আয়াত নং ৮৯)।

আরো বলা হয়েছে : ‘সে বাগানসমূহ এমন যে, তার ফলসমূহ চিরন্তন এবং ছায়াও চিরস্থায়ী’ (আর- রাদ : ৩৫)।

আরো বলা হয়েছে : ‘বেহেশতের অধিবাসীদের জন্যে রয়েছে পাক- পবিত্রা স্ত্রী’ (সূরা : আল- ইমরান, আয়াত নং ১৫)।

অনুরূপভাবে কোরআন ও হাদীসে অপরাধীদের শাস্তির ব্যাপারে দেখা যায় যে, তার বাহ্যিক দিক রয়েছে, যেমন দোযখের আগুনে পোড়ানো ও যন্ত্রনাদায়ক নানা প্রকার সাজা ইত্যাদি, এ সবই বাহ্যিক প্রতিদানের দিক নির্দেশ করছে।

কিন্তু সবচেয়ে গু পূর্ণ দিক হচ্ছে আধ্যাত্মিক প্রতিদানের বিষয়টি। আল্লাহর নূরানী মা'রেফাত, তাঁর আধ্যাত্মিক নৈকট্যলাভ ও তাঁর সৌন্দর্য ও মহিমার দীপ্তি দর্শন। এসব এমন এক স্বাদ ও উপভোগের বিষয়- যা কোন ভাষা বা বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কোরআনের কোন কোন আয়াতে বেহেশ্তের পার্থিব নেয়ামতসমূহের কথা (যেমন ফুলে ফলে সমৃদ্ধ ও পাক- পবিত্রার কথা বলার পর) আরো বলছে : 'খোদার সন্তুষ্টী এসব কিছুর উর্ধে'। অতঃপর আরো বলছে :অর্থাৎ 'এটাই হলো বিরাট বিজয়' (সূরা : আত- তাওবাহ্, আয়াত নং ৭২)।

জী হ্যাঁ; এর চেয়ে উ ম ও উচ্চতর স্বাদ ও মজাদায়ক বিষয় আর কি হতে পারে যে, মানুষ উপলব্দি করবে যে, সে তার মহান প্রভুর নিকট গৃহিত হয়েছে এবং তার প্রভুর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দির স্বীকৃতির অন্তর্ভূক্ত হতে পেরেছে।

ইমাম আলী ইবনিল হোসাইন (জয়নুল আবেদীন) (আঃ) বলেন :

'মহান আল্লাহ্ তাদেরকে বলেন : তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি ও ভালবাসা সে সব নেয়ামতসমূহ অপেক্ষা অতি উ ম যার মধ্যে এখন তোমরা লিপ্ত আছো.....' (তাফসীরে আ' ইয়্যাশী, সূরা : আত- তাওবাহ, ৭২নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগ উদ্ধৃত গ্রন্থ, যা আল- মীযান ৯ম খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে)।

তাঁরাও (বেহেশতীরা) একথা শুনে সত্যায়ন করবে। বস্তুতঃ এর চেয়ে মজার ব্যাপার আর কি হতে পারে যে, মানুষ এ জাতীয় সম্ভাষণের অধিকারী হবে :

'হে পরিতৃপ্ত ও নিশ্চিত আত্মা! ফিরে এসো তোমার প্রভুর প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে, আর তোমার প্রভুরও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট ও রাজী। আর আমার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও ও আমার জান্নাতে প্রবেশ করো' (সূরা : আল- ফাজর, আয়াত নং ২৭- ৩০)।

৪৪. সব সময়ই ইমাম বর্তমান আছেন :

আমরা বিশ্বাস করি : মহান আল্লাহর প্র া ও দর্শনে যেমন মানুষের হেদায়েতের জন্যে নবী ও রাসূলগণকে পাঠানো অপরিহার্য কর্তব্য ছিল, ঠিক তেমনি তাঁরই হিকমত ও প্র ার দাবী হচ্ছে যে, রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর পর প্রত্যেক যুগে ও সময়েই মানুষের হেদায়েতের জন্যে তাঁর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমাম বা নেতা পাঠানো অপরিহার্য কর্তব্য । যাতে করে তাঁরা নবী-রাসূলগণের শরীয়ত ও আল্লাহর দ্বীনকে বিকৃতি ও পরিবর্তনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। প্রত্যেক সময় মানুষের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো স্পষ্ট করে দিতে পারেন এবং লোকদেরকে আল্লাহ্ ও রাসূল (সাঃ) অনুসৃত আইন ও বিধানের অনুশীলনের প্রতি দাওয়াত দিতে পারেন। তা না হলে মানুষের সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য ছিল, "পরিপূর্ণতা ও কল্যাণের চুড়ান্ত পর্যায় গিয়ে উপনীত হবে" তা ব্যহত ও ব্যার্থ হয়ে যাবে। মানুষ হেদায়েতের পথ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। নবী- রাসূলগণের শরীয়ত অসার হয়ে পড়বে। আর মানুষ নিরাশ্রয় ও দিশেহারা হয়ে দিক- বিদিক ঘুরবে।

এ কারণেই আমরা বিশ্বাস করি যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর পর থেকে প্রত্যেক যুগে ও কালে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনিত ইমাম এ পৃথিবীতে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। আল্লাহ্ বলেন :

'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তাকওয়া ও খোদাভি তার নীতি অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও' (সূরা : আত- তাওবাহ্ আয়াত নং ১১৯)।

এ আয়াতটি কোন বিশেষ কাল বা সময়ের জন্যে নির্দিষ্ট নয়। আর সত্যবাদীদের সংগী- সাথী হওয়ার বিষয়টি কোন প্রকার শর্তাবলী ব্যাতীতই এ কথা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক যুগেই মা'সুম ইমাম বর্তমান রয়েছেন যার অনুসরণ করা উচিৎ এবং করতে হবে। যেমন নাকি শিয়া- সুন্নী উভয় মাযহাবেরই বহু মোফাস্সিরগণ এ বিষয়ে ইংগিত করেছেন।

আল্লামা ফখ দ্দীন রাজী এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাপক আলোচনার এক পর্যায়ে এভাবে বললেন : এ আয়াতটি এ বিষয়টিকে প্রমাণিত করছে যে, যে ব্যক্তি মা'সুম নয় অর্থাৎ যার পাপ করার অবকাশ আছে তার জন্যে অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে যে, এমন ব্যক্তির সহগামী

হবে ও তাঁর অনুসরণ করবে যিনি নিস্পাপ- মা'সুম। আর মা'সুম হচ্ছেন সে সমস্তব্যক্তিবর্গ যাঁদেরকে মহান আল্লাহ ছাদেকীন (সত্যবাদীগণ) বলে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এ কথা ও বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যাদের গুনাহ্ করার অবকাশ আছে তাদের জন্যে অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে মা'সুমগণের সহগামী ও সাথী হওয়া। যাতে মা'সুমগণ তাদেরকে গুনাহ্ থেকে বিরত রাখতে পারেন। আর একথা সর্ব কালের জন্যেই প্রযোজ্য। কোন বিশেষ সময়ের জন্যে নির্দিষ্ট নয়। আরও প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক যুগেই মা'সুম বর্তমান থাকবেন। (তাফসীরে কবীর, ১৬শ খঃ, পৃঃ ২২১)

৪৫. ইমামতের তাৎপর্য :

আমরা বিশ্বাস করি : ইমামত শুধুমাত্র বাহ্যিক সরকার প্রধানের পদের নামই নয়। বরং ইমামতের পদমর্যাদা অনেক উঁচু আধ্যাত্মিক ও আত্মিক জগতে বিস্তৃত ও বিরাজমান। ইমাম, ইসলামী সরকারের নেতৃ ছাড়াও দ্বীন ও দুনিয়ার সকল বিষয়ের পরিচালনার দায়ি পালন করেন। মানুষের মন ও চিন্তাকে পরিশুদ্ধ করেন এবং রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর শরীয়াতকে সব রকমের বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে রক্ষা করেন। আর রাসূল (সাঃ) যে উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন তা বাস্তবায়ন করেন।

ইমামত সে সুমহান ও সুউচ্চ পদমর্যাদা- যা মহান আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহীমকে (আঃ) নবুয়্যত ও রিসালত এর মত মহা মর্যাদাবান পথ অতিক্রম করার পর এবং বহু সংখ্যক পরীক্ষা- নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর দান করেছেন। তিনিও তাঁর বংশধরকে এ পদে নিয়োগের ধারা অব্যাহত রাখার আবেদন জানালেন। জবাবে আল্লাহ্ বললেন যে, জালিম ও গুনাহগারের জন্যে এ পদ প্রজোয্য নয়। আর কোরআনে বিষয়টি এভাবে এসেছে :

‘স্মরণ কর সে সময়ের কথা- যখন ইব্রাহীমকে তাঁর প্রভূ বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা নিয়েছিলেন আর তিনি প্রত্যেকটি পরিক্ষায় সম্পূর্ণরূপে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হলেন। তখন আল্লাহ্ বললেন : আমি তোমাকে মানব জাতীর ইমাম বানাব, তিনি বললেন, অমার বংশধর থেকেও? আল্লাহ্ বলেন : আমার প্রতিশ্রুতি (ইমামতের এ ধারা) কখনও জালিম ও পাপীদের ক্ষেত্রে প্রজোয্য হবে না (কেবলমাত্র তোমারই বংশধর থেকে যারা মা‘সুম হবেন তাদেরকেই ইমামতের পদে নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গিকার প্রদান করলাম’(সূরা : আল- বাকারাহ, আয়াত নং ১২৪)।

স্বতঃসিদ্ধ যে, এমন একটি মহা মর্যাদাবান পদবী শুধুমাত্র রাষ্ট্রসরকারের নেতৃ দানের মধ্যেই সীমিত থাকার বিষয় নয়। আর ইমামতের বিষয়টিকে আমরা এখন যেভাবে তুলে ধরলাম যদি সেভাবে বিশ্লেষণ করা না হয় তাহলে উপরোক্ত আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য অস্পষ্ট থেকে যায়।

আমরা বিশ্বাস করি : সমস্ত উলুল আজম (উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও দৃঢ় প্রত্যয়ী) নবীগণ ইমামতের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের রিসালত ও নবুয়্যতের সাথে যা কিছু উপস্থাপন করতেন তা বাস্তবে রূপায়ন করতেন। তাঁরা মানুষের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক এবং বাহ্যিক ও গোপন নেতা ছিলেন। বিশেষতঃ বিশ্ব নবী (সাঃ) তাঁর নবুয়্যতের সূচনালগ্ন থেকেই ইমামতের সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং খোদায়ী নেতৃ ে র পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর দায়ি কেবলমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সংবাদ পরিবেশন করা পর্যন্তই সীমিত ছিল না।

আমরা বিশ্বাস করি : ইমামতের এ ধারা রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর পরও তাঁরই বংশধরের এক মা'সুম ধারার মাধ্যমে অব্যাহত আছে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা খুব ভালভাবে জানা গেল যে, ইমামতের এ মহা মর্যাদায় পৌছাঁর জন্যে অনেক কঠিন শর্তাবলী রয়েছে। তাকওয়া বা খোদাভী তার দিক থেকে এমন হতে হবে যে, সর্বপ্রকারের গুনাহ্ মুক্ত ও মা'সুম থাকবেন। এমনকি ছোট কোন পাপও করবেন না। আবার ান ও প্র ার দিক থেকে এমন হতে হবে যে, দ্বীনের সমস্ত বিধান ও আইন- কানুন এবং দ্বীনের যাবতীয় অন্য সকল বিষয়ে পূর্ণ ানের অধিকারী হতে হবে। সর্বস্ত রের মানুষ সম্পর্কে ও মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। সময়- কাল, পরিবেশ, পরিস্থিতি ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ান থাকতে হবে।

৪৬. ইমাম পাপ- তাপের উর্ধে :

আমরা বিশ্বাস করি : ইমামকে সকল প্রকারের গুনাহ্ থেকে মুক্ত ও মা'সুম হতে হবে। উপরোক্ত আয়াতের যে ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ আমরা এখানে উপস্থাপন করেছি, এ ছাড়াও অমা'সুম বা পাপ- তাপ বিশিষ্ট ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গরূপে মানুষের নিকট নির্ভর যোগ্য হতে পারে না। দীনের মৌলিক ও শাখা- প্রশাখাগত বিষয়াদিও তার কাছ থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে না। এ কারণেই আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে : ইমামের কথা ও বক্তব্য তাঁর অনুমোদিত বিষয়াদী ইসলামী শরীয়তের হুজ্বাত ও

দলীল। (তাঁর অনুমোদনের অর্থ হচ্ছে : তাঁর সামনে কোন কাজ কেউ সম্পাদন করেছে আর তিনি তাতে নীরব ভূমিকা পালন করেছেন। এর অর্থ হল তিনি অনুমোদন করেছেন)।

৪৭. ইমাম শারীয়াতের রক্ষক :

আমরা বিশ্বাস করি : ইমাম নতুন কোন শারীয়াত ও নতুন কোন আইন বিধান নিয়ে আসবেন না। বরং তাঁর দায়ি ও কর্তব্য হচ্ছে রাসুলে আকরাম (সাঃ) এর অনুসৃত শারীয়াত ও আইন- বিধানের সংরক্ষণ করা। তাঁর কাজ হচ্ছে এ পবিত্র জীবনাদর্শের প্রচার- প্রসার, শিক্ষা- দীক্ষা, দীনের হেফাজত, দ্বীনের পরিচিতি তুলে ধরা ও মানুষকে হেদায়েতের দিকে আহ্বান করা।

৪৮. ইমাম ইসলামের সব চেয়ে বি ব্যি :

আমরা আরও বিশ্বাস করি : ইমামকে ইসলামের মৌলিক ও শাখা- প্রশাখাগত হুকুম- আহকাম ও আইন- বিধান ও কোরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গরূপে অবগত থাকতে হবে। তাঁর নিকট যে ইলম ও ান থাকবে সেটা খোদা প্রদ এবং রাসূল আকরাম (আঃ) এর মাধ্যমে তাঁর নিকট পৌঁছবে। হ্যাঁ ইমামের ান- প্র া এমন যে, সম্পূর্ণরূপে মানুষের আস্থা ও নির্ভরতা অর্জন করতে সক্ষম। ইসলামের হাকিকত সম্পর্কে জানার জন্যে মানুষ তার উপর পুরাপুরি ভরসা করতে পারে।

৪৯. ইমাম আল্লাহর মনোনীত হতে হবে :

আমরা বিশ্বাস করি : ইমাম তথা রাসূলের উওরসুরী আল্লাহর পক্ষ থেকে মানসূব হতে হবে। অর্থাৎ রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ ও অক্যট্য বক্তব্যসমূহ এবং প্রত্যেক ইমামই তাঁর পরবর্তী ইমাম সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিবেন, এ পদ্ধতিতে ইমাম নির্দিষ্ট হবেন। অন্যভাবে কথাটি এরূপ : ইমামও রাসূল (সাঃ) এর মত আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োগ ও নিযুক্ত হতে হবে। যেমন পূর্বোল্লেখিত আয়াতে ইব্রাহীম (আঃ) এর ইমামত সম্পর্কে আমরা জেনেছি :অর্থাৎ 'আমিই

তোমাকে মানুষের ইমাম নিয়োগকারী'। এ মনোনয়ন পদ্ধতি ছাড়াও নিষ্পাপ- নিস্কলঙ্ক থাকার মত তাকওয়া- পরহেযগারী এবং আল্লাহর দ্বীনের সকল বিষয়ের শিক্ষা- দীক্ষায়, হুকুম- আহকাম ও আইন- বিধানের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ভুল- ভ্রান্তি ব্যতিরেকে সর্বোচ্চ ানের অধিকারী হবেন। আল্লাহ্ ও রাসূল ব্যতীত অপর কেউ তঁদের চেয়ে ানি হবে না। এ কারণেই আমরা এ মা'সুম ইমামগণের ইমামত বা নেতৃে র বিষয়টি গণ নির্বাচনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ বলে জানি না।

৫০. ইমামগণ আল্লাহর রাসূল কর্তৃক নির্দিষ্ট :

আমরা বিশ্বাস করি : হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁর পরর্বতী ইমামগণকে নিজেই মনোনীত ও নির্দিষ্ট করে গেছেন। এক স্থানে তিনি বিরাট জন সমুদ্রের সন্মুখে বিখ্যাত "হাদীসে সাকালাইনে" বলেছেন। ছহীহ্ মুসলিমে কথাটি এভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে : রাসূলে আকরাম (সাঃ) মক্কা ও মদীনার মাঝে "খোম" নামক স্থানে দন্ডায়মান হলেন এবং জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন : খুব শিঘ্রই আমি তোমাদের মধ্যে থেকে চলে যাব। অতঃপর বললেন :

'আমি অত্যন্ত গু পূর্ণ ও মূল্যবান দু' টি জিনিষ তোমাদের মধ্যে রেখে যাচ্ছি। তাঁর প্রথমটি হল আল্লাহর কিতাব আল- কোরআন- যার মধ্যে হেদায়েত ও নূর রয়েছে....। আর দ্বিতীয়টি হল আমার আহলে বাইত। আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে তোমরা খোদাকে ভুলে যেও না' (এ বাক্যটি তিনি তিনবার পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করলেন)।

১- ছহীহ্ মুসলিম, খঃ- ৪র্থ, পৃঃ- ১৮৭৩। ঠিক একই অর্থে ছহীহ তিরমিযিতেও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অধিকন্ত সেখানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে : যদি এ দুটিকে ভালভাবে আকঁড়ে ধরে থাক তাহলে কখনও পথভ্রষ্ট- গোমরাহ্ হবে না।

২- ছহীহ্ তিরমিযি, খঃ- ৫ম, পৃঃ- ৬৬২। এ হাদীসটি সুনানে দারেমীতে ২য় খঃ, পৃঃ ৪৩২। খাছায়েছে নাসাঈ, পৃঃ নং ২০। মুসনাদে আহমাদ ৫ম খঃ, পৃঃ নং ১৭২ ও কানযুল ওম্মাল, ১ম খঃ, পৃঃ নং ১৮৫। এ ছাড়া ও অধিকাংশ বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সমূহে লিপিবদ্ধ আছে।

অস্বীকার করার কিংবা সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই যে, এ হাদীসটি একটি হাদীসে মোতাওয়াতের হিসাবে সর্বজন বিদিত। কোন মুসলমানই এ হাদীসটিকে অস্বীকার করার সাহস করতে পারে না। এ ছাড়া ও বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে, রাসূলে আকরাম (সাঃ) একবার দু' বার নয় বরং বারবার বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন পরিবেশে এ হাদীসটি পুনঃপুনঃ বলেছেন। স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, রাসূলের আহলে বাইতের সমস্ত লোকই এ উঁচু মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না, যা কোরআনের পাশাপাশি ও কোরআনের সমপর্যায়ের একটি উঁচু স্থান।

সুতরাং রাসূলের বংশধরের শুধুমাত্র মা'সুম ইমামগণের প্রতিই এ হাদীস ইংগিত করছে। (মনে রাখতে হবে "আহলে বাইত" কথাটির স্থলে "সুন্নতী" শব্দটি প্রয়োগ করে যে হাদীস দেখতে পাওয়া যায় তা একটি দূর্বল ও সন্দেহজনক হাদীস)।

এ ছাড়া অপর একটি হাদীস ছহীহ্ বোখারী, ছহীহ্ মুসলিম, ছহীহ্ তিরমিযি, ছহীহ্ আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল ও অন্যান্য আরও অনেক গ্রন্থে এসেছে। আমরা সে হাদীসটি দ্বারাও আমাদের স্বপক্ষে দলীল- প্রমাণ উপস্থাপন করব। রাসূল (সাঃ) বলেন :

'দ্বীন ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যে পর্যন্ত বারজন খলিফা তোমাদের উপর হুকুমত করবেন; যাঁরা সকলেই কোরাইশ থেকে হবেন' (ছহীহ্ মুসলিম, ৩য় খঃ, ১৪৫৩ নং পৃষ্টায় রাসূলে আকরাম (সাঃ) থেকে জনাব জাবের ইবনে সামারাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। সামান্য পার্থক্য সহকারে উপরোল্লেখিত সনদটি অন্যান্য গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ হয়েছে। ছহীহ্ বোখারী, ৩/১১০১, ছহীহ্ তিরমিযি, ৪/৫০১, ছহীহ্ আবু দাউদ, ৪র্থ খঃ, কিতাবুল মাহদী)।

আমরা বিশ্বাস করি : এ হাদীসের ব্যাপারে আমরা ইমামিয়া শিয়ারা বার ইমাম সম্পর্কিত যে আকীদা- বিশ্বাস পোষণ করি তা ব্যতীত, অন্য কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার চিন্তাও করি না। একটুখানি চিন্তা- ভাবনা করে দেখুন; এ ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা কি করা যেতে পারে?

৫১. হযরত আলীর মনোনয়ন রাসূল (সাঃ) কর্তৃক :

আমরা বিশ্বাস করি : রাসূলে আকরাম (সাঃ) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষে হযরত আলীকে (মহান আল্লাহর নির্দেশে) নিজের স্থলাভিষিক্ত ও উ াধিকারী হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তন্মধ্যে গাদীরে খোমের অনুষ্ঠান দিনের আলোর মত পরিস্কার। রাসূলে আকরাম (সাঃ) বিদায় হজ্বের সমাপ্তির পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন কালে গাদীরে খোমে তাঁর সাহাবাদের বিরাট এক জন-সমাবেশে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন :

'হে লোক সকল! আমি কি তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে তোমাদের নিজেদের চাইতে অগ্রাধিকার রাখি না? লোকেরা বললো : জী হ্যাঁ! রাসূল (সাঃ) বললেন : তাহলে আমি যাদের উপর অগ্রাধিকার রাখি ও যাদের মাওলা (নেতা ও শাসক), আলীও তাদের মাওলা (নেতা ও অগ্রাধিকার রাখে)।

এ হাদীসটি অসংখ্য সূত্রে রাসূলে আকরাম (সাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা সাহাবাগণের মধ্যে থেকে সর্ব মোট ১১০ জন ও তাবেঈনদের মধ্যে থেকে ৮৪ জন এবং ৩৬০টি প্রসিদ্ধ হাদীসও ইসলামের ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা বিস্তারিতভাবে লেখা এভাবে সম্ভব নয়। (পায়ামে কোরআন, ৯ম খঃ, পৃঃ নং ১৮১)।

যেহেতু এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আকীদা- বিশ্বাস সংক্রান্ত এবং আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এ নয় যে, আমরা যুক্তি- তর্কের ময়দানে অবতীর্ণ হবো; কাজেই সংক্ষেপে এতটুকুন বলব যে, উল্লেখিত হাদীসটি এমন কোন হাদীস নয় যে, যাকে খুব সহজে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারা যায়। অথবা শুধুমাত্র বন্ধু ও ভালবাসার ব্যাখ্যা করে মোড় ঘুরিয়ে দেয়া যায়। যেখানে আল্লাহর নবী (সাঃ) এত সব আয়োজন- ব্যবস্থাপনা ও গু ারোপ করেছেন।

এটা কি সে বিষয় নয়- যা জনাব ইবনে আছির তাঁর "কামেল ইবনে আসিরে" আলোচনা করেছেন? তিনি লিখেন : হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁর নবুয়্যতী মিশনের প্রথম দিকে যখন এ আয়াত নাযিল হল :

‘হে রাসূল! তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের আল্লাহর ভয় প্রদর্শন কর। তখন রাসূল (সাঃ) তাঁর নিকটতম আত্মীয়- স্বজনদেরকে সমবেত করলেন এবং ইসলামের আহ্বান তাদের সামনে তুলে ধরলেন’। অতঃপর বললেন :

‘তোমাদের মধ্যে কে আছ আমার এ কাজে আমাকে সাহায্য- সহযোগিতা করবে? যাতে করে আমার ভ্রাতা ও আমার ভারপ্রাপ্ত দ্বায়ি শীল ও আমার খলিফা (উ ারধিকারী) তোমাদের মাঝে থাকবে’?

সে সময় রাসূলের এ আহ্বানে আলী ছাড়া আর কেউ সাড়া দেয়নি। আলী (আঃ) বললেন :অর্থাৎ ‘হে আল্লাহর নবী! আমি আপনার এ কাজে আপনার সাহায্যকারী ও সহযোগী থাকবো’। রাসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁর প্রতি ইংগিত করে বললেন :

‘এ যুবকই আমার ভ্রাতা, আমার স্থালাভিষিক্ত দ্বায়ি শীল ও আমার উ রাধিকারী খলীফা তোমাদের মাঝে’(কামেল ইবনে আছীর, ২য় খঃ, পৃঃ নং ৬৩০, বৈরূত সংস্করণ, দারু ছাদের, সামান্য পার্থক্য সহকারে অভিন্ন অর্থে লিপিবদ্ধ আছেঃ মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, খঃ- ১ম, পৃঃ- ১১ এবং ইবনে আবিল হাদীদ- শারহে নাহজুল বালাগাহ্ খঃ- ১৩, পৃঃ- ২১০। আরো অনেকেই নিজ নিজ গ্রন্থে ’ লিপিবদ্ধ করেছেন)।

এটা কি সে বিষয় নয়- যা রাসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে চেয়েছিলেন আরেকবার সে বিষয়টিকে বলবেন এবং এর উপর গু ারোপ করবেন? ছহীহ্ বোখারীর ভাষ্য অনুযায়ী রাসূল (সাঃ) এভাবে নির্দেশ দিলেন :

‘লিখার উপকরণ নিয়ে এসো তাহলে এমন এক লিপি তোমাদের জন্যে লিখে দেব, যার আলোকে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ঠ- গোমরাহ্ হবে না। এর পর হাদীসের অব্যাহত ধারায় এসেছে যে, কোন কোন লোক এ পর্যায়ে রাসূলের সাথে বিরোধে অবতীর্ণ হয়েছে। এমনকি রাসূলের শানে অসম্মানজনক উক্তি করেছে এবং লিখার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। (ছহীহ্ বোখারী, ৫ম খঃ, পৃঃ ১১, বাবে মরাজুন্নাবী, ছহীহ্ মুসলিম ৩য় খ পৃঃ নং ১২৫৯)।

আবারও বলছি : আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে সংক্ষিপ্ত যুক্তি- প্রমাণের মাধ্যমে আমাদের আকীদা- বিশ্বাসের বিষয়টি উপস্থাপন করা। এর অধিক কিছু না। তাহলে আমাদের এ আলোচনা অন্য রকম রূপ পরিগ্রহ করত।

৫২. প্রত্যেক ইমামই পূর্ববর্তী ইমাম কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত :

আমরা বিশ্বাস রাখি : বার ইমামের প্রত্যেকেই পূর্ববর্তী ইমামের মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১ম হচ্ছেন ইমাম আলী ইবনে আবী তালিব (আঃ), ২য় হচ্ছেন তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র ইমাম হাসান (আঃ), ৩য় হচ্ছেন শহীদদের সরদার ইমাম হোসাইন (আঃ), ৪র্থ হচ্ছেন ইমাম আলী ইবনুল হোসাইন (আঃ), ৫ম হচ্ছেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী (আঃ), ৬ষ্ঠ হচ্ছেন ইমাম জা' ফর ইবনে মুহাম্মাদ (আঃ), ৭ম হচ্ছেন ইমাম মূসা ইবনে জা' ফর (আঃ), ৮ম হচ্ছেন ইমাম ইমাম আলী ইবনে মূসা (আঃ), ৯ম হচ্ছেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী (আঃ), ১০ম হচ্ছেন ইমাম আলী ইবনে মুহাম্মাদ (আঃ), ১১তম হচ্ছেন ইমাম হাসান ইবনে আলী (আঃ), ও ১২তম হচ্ছেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনিল হাসান আল মাহদী (আঃ) এবং তিনিই সর্বশেষ ইমাম।

আমাদের আকিদা- বিশ্বাস মতে তিনি জীবিত ও অদৃশ্যে আছেন। (যেদিন আল্লাহর নির্দেশ লাভ করবেন সেদিন আত্ম প্রকাশ করবেন)। অবশ্য ইমাম মাহদী (আঃ) এর বিশ্বাসের ব্যাপারটি, যিনি পৃথিবীতে আবির্ভুত হবার পর সমগ্র দুনিয়া ব্যাপী সমাজের কানায় কানায় ন্যায়- ইনসাফ পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করবেন যেমনটি পৃথিবী অন্যায়- অবিচারে ভরপুর ছিল; এটা শুধুমাত্র আমাদের শিয়াদের জন্যেই নির্দিষ্ট নয়; বরং সমস্ত মুসলমানরাই এ বিশ্বাস রাখেন। আহলে সুন্নাতের কোন কোন ওলামাগণ ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমন সম্পর্কিত হাদীস মোতাওয়াতের হওয়ার ব্যাপারে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। এমনকি ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে কয়েক বছর পূর্বে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী একটি প্রবন্ধে ইমাম মাহদী (আঃ) এর আত্ম প্রকাশের বিষয়টি সর্বজন বিদিত সত্য বলে উল্লেখ করার সাথে সাথে এর প্রতি গু ারোপ করা

হয়েছে এবং বহু সংখ্যক হাদীসও বর্ণনা প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছে। (এ প্রবন্ধটি ২৪শে শাওয়াল ১৩৯৬ হিজরী সালে রাবেতায়ে আলামে ইসলামীর "ইদারাতু মাজমাউল ফেকহিল ইসলামী" বিভাগের প্রধান জনাব মুহাম্মাদ আল মুনতাছির আল কিনানী স্বাক্ষরিত)। তবে তাদের অনেকেই বিশ্বাস করে যে, ইমাম মাহদী (আঃ) শেষ জামানায় জন্ম গ্রহণ করবেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে তিনি ১২তম ইমাম এবং বর্তমানে জীবিত আছেন। আর মহান আল্লাহ যখন তাঁকে দায়ি দিয়ে পাঠাবেন তখন তিনি ভূ-পৃষ্ঠকে জোর- জুলুম থেকে মুক্ত করে সুবিন্যস্ত করার জন্যে এবং ন্যায়- ইনসাফ সমৃদ্ধ খোদায়ী শাসন প্রতিষ্ঠত করার জন্যে বিল্পব ঘটাবেন।

৫৩. আলী (আঃ) শ্রেষ্ঠতম সাহাবী :

আমরা বিশ্বাস করি : হযরত আলী (আঃ) সাহাবাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী এবং নবী করিম (সাঃ) এর পর ইসলামী উম্মাহর সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনকে আমরা হারাম বলে জানি। আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে যে, যারা হযরত আলীকে খোদার স্থলে স্থান দেয় অথবা এ জাতীয় কিছু চিন্তা- ভাবনা করে আমরা তাদেরকে কাফির ও মুশরিক এবং মুসলমানদের দল থেকে বহির্ভূত বলে মনে করি। আর তাদের প্রতি আমরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট যদিও তাদের নাম দুঃখজনক ভাবে শীয়াদের সাথে মিশ্রিত। এ ব্যাপারে কখনো কখনো ভুল- ভ্রান্তিও ছড়ানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সব সময়ই শিয়া ইমামিয়া ওলামাগণ নিজেদের বইপুস্তকে এ দলটিকে ইসলাম বিরোধী বলে গণনা করেছেন।

৫৪. ইতিহাস ও বিবেকের দৃষ্টিতে সাহাবা :

আমরা বিশ্বাস করি : রাসূলে আকরাম (সঃ) এর সাথীগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক সাথী ছিলেন উঁচু মর্যাদার অধিকারী, আত্মোৎসর্গকারী ও ব্যক্তি সম্পন্ন। কোরআন ও হাদীসে তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা রয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, রাসূলের সমস্ত সাহাবাদেরকেই

আমরা নিস্পাপ- মা'সুম বলে মনে করব এবং তাদের কাজ- কর্মগুলো নিয়ম বহির্ভূত কি না তা যাচাই বাছাই না করেই সঠিক বলে ধরে নেব। কেননা, কোরআন মজীদে বহু সংখ্যক আয়াতই (যেমন : সূরা বারায়াতে, সূরা নূরে, সূরা মুনাফিকীনে) মুনাফিকদের সম্পর্কে- রয়েছে। যারা রাসূলের সাহাবাদের মাঝেই ছিল। বাহ্যতঃ তারা রাসূলের সাহাবী হিসাবেই পরিগণিত হত। প্রকৃতপক্ষে আল- কোরআন খুব কঠোরভাবে তাদেরকে তিরস্কার ও ধিক্কার দিয়েছে। অপরদিকে যারা রাসূলের পরে মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধের মশাল জ্বালিয়েছে ও সমকালিন খলিফার সাথে কৃত বাইআত (শপথ) ভঙ্গ করেছে এবং হাযার হাযার মুসলমানদের রক্ত ঝরিয়েছে; আমরা কি এ সমস্ত লোকদেরকে সবদিক থেকে পাক- পবিত্র মনে করতে পারি?

অন্য কথায় কি করে সম্ভব যে, যুদ্ধের (যেমন জংগে জামাল ও জংগে সিফফিনের) দু' পক্ষকেই সত্যানুসারী ও পবিত্র বলে মনে করবো? এটাতো পরস্পর বিরোধী ব্যাপার এবং আমরা তা মেনে নিতে পারি না। যারা এ বিষয়টির বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে ইজতেহাদ এর ব্যাপারটি যতেষ্ট মনে করে তারা বলে, দু' পক্ষের এক পক্ষ অবশ্যই সত্যপন্থী ছিল ও অপর পক্ষ অপরাধী। কিন্তু তারা যেহেতু নিজেদের ইজতেহাদের উপর আমল করেছে, তাই খোদার নিকট তারা অক্ষম। বরং তারা তাতে পুণ্যের কাজ করেছে। এ জাতীয় কথা- বার্তা গ্রহণ করে নেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, ইজতেহাদের বাহানা ও ছুতা ধরে রাসূলের উ রাধিকারীর সাথে কৃত বাইআত (শপথ) ভঙ্গ করতে পারে, অতঃপর যুদ্ধের অগ্নি শিখা- প্রজ্বলিত করে নিরাপরাধ লোকদের রক্ত বন্যা প্রবাহিত করতে পারে? যদি এত সব রক্তপাত ইজতেহাদের উছিলা ধরে ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে জগতে এমন কোন কাজ নেই যার ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করা যায় না?

আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলবো যে, আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে : সমস্ত মানুষই এমনকি রাসূলের সাহাবারাও নিজেদের আমল বা কাজ- কর্মেও নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কোরআনের এ মৌলিক নীতি :

‘তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সন্মানিত সে বক্তি, যে সব চেয়ে বেশী খোদাভী তার নীতি অবলম্বন করেছে। তাদের (সাহাবাদের) ক্ষেত্রেও এ নীতিই বাস্তব ও সত্য। সুতরাং তাদের অবস্থান ও তাদের আমল- অনুশীলণের ভি তে বিচার করে দেখব এবং এ পর্যায়ে তাদের ব্যাপারে একটা যুক্তিসংগত বিচার- ফয়সালার সন্ধান করব। আর বলব : যারা রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর যামানায় মোখলেছ (ঐকান্তিক) সাহাবাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন এবং রাসূলের পরেও ইসলামের হেফাজতের চেষ্টায় মগ্ন ছিলেন ও কোরআনের সাথে কৃত অঙ্গিকারের যথাযথ অনুসরণ করেছেন, তাঁদেরকে আমরা ভাল বলে জানব এবং তাঁদের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করবো। আর যারা রাসূলের জীবদ্দশায় মোনাফিকদের দলভুক্ত ছিল ও রাসূলের যামানায় এমন সব কাজকর্ম সম্পাদন করেছে যাতে রাসূলের পবিত্র আত্মা ব্যথিত ও বিড়ম্বিত হয়েছে; অথবা যারা রাসূলের মৃত্যুর পর নিজেদের মত ও পথ পরিবর্তন করে এমন সব কাজ- কর্মে লিপ্ত হয়েছে যা ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতির কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে, তাদেরকে আমরা ভালবাসি না । আল্লাহ্ বলেন :

‘এমন কোন জাতি তুমি পাবেনা যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা সে সমস্ত লোকদের সাথে বন্ধু স্থাপন করেছে যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরোধী। যদি ও তারা (খোদা বিরোধীরা) তাঁদের (ইমানদারদের) পিতা কিংবা তদের সন্তানাদি অথবা ভ্রাতৃবর্গ কিংবা নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন। এরা সে সমস্ত লোক যাঁদের অন্তরে আল্লাহ্ ইমানকে দৃঢ় করে দিয়েছেন’ (মুজাদিলাহ্ : ২২)।

হ্যাঁ, যারা রাসূলের জীবদ্দশায় এবং রাসূলের মৃত্যুর পর তাঁর হৃদয়কে ব্যাথিত ও আড়ম্বিত করেছে তারা আমাদের বিশ্বাস মতে প্রশংসার যোগ্য নয়।

কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, রাসূলের সাহাবাদের মধ্যে একদল সাহাবা ইসলামের উন্নতিকল্পে বিরাট বিরাট কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশংসার পাত্র হয়েছেন। অনুরূপভাবে যাঁরা তাঁদের পরবর্তীতে আগমন করেছেন অথবা আগামীতে কেয়ামত পর্যন্ত আগমন করবেন এবং রাসূলের খাঁটি ও সত্যিকারের সাহাবাদের নীতি- পন্থা অবলম্বন

করবেন ও তাঁদের কর্মসূচীকেই অব্যাহত রাখবেন তাঁরা অবশ্যই সব রকম প্রশংসার পাত্র । আল্লাহ্ বলেন :

'আর যারা মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে অগ্রবর্তী ও প্রথম, আর যাঁরা নেক কাজে তাঁহাদের অনুগামী, আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট ও রাযী, আর তাঁরাও আল্লাহর প্রতি রাযী ও সন্তুষ্ট' (সূরা : তাওবাহ, আয়াত নং ১০০)।

এ হলো সাহাবাদের সম্পর্কে আমাদের আকিদা- বিশ্বাসের সারকথা।

৫৫. আহলে বাইতের ইমামগণের ান রাসূল থেকে প্রাপ্ত :

আমরা বিশ্বাস করি : হাদীসে মোতাওয়াতের মোতাবেক রাসূলে আকরাম (সাঃ) কোরআন ও আহলে বাইত (আঃ) সম্পর্কে আমাদের প্রতি যে নির্দেশ প্রদান করেছেন, তা হচ্ছে আমরা যেন এ দুটি বস্তু থেকে আমাদের হাত গুটিয়ে না নেই, তাহলে আমরা হেদায়েতের পথে থাকতে পারব না। এ ছাড়াও আমরা আহলে বাইতের ইমামগণকে নিস্পাপ- মা'সুম বলে জানি। তাঁদের সমস্ত বলা বক্তব্য ও কাজ- কর্মসমূহকে আমাদের জন্যে হুজ্জাত ও দলীল বলে মনে করি। অনুরূপভাবে তাঁদের অনুমোদনকেও (অর্থাৎ তাঁদের সামনে কোন কাজ সম্পাদিত হলে তাঁরা তাতে নিষেধ করেননি)। এরই ভি তে আমাদের ফেকহী মাসয়ালা- মাসায়েল নির্ণয়ের জন্যে কোরআন ও রাসূলের হাদীসের পর ইমামগণের কথা, কাজ ও অনুমোদনকে একটি উৎস বলে জানি।

বহু সংখ্যক নির্ভরযোগ্য হাদীস মোতাবেক আমরা যখন আহলে বাইতের এ উক্তিটির প্রতি লক্ষ্য করি যে, তারা বলেছেন : তাঁরা যা কিছু বলেন তা তাঁদের পূর্বপূ ষদের থেকে, তাঁরা রাসূলে আকরাম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তখন আমাদের নিকট পরিস্কার হয়ে যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের বর্ণনা রাসূলে আকরাম (সাঃ) এরই বর্ণনা। আমরা জানি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনাকারীগণের বর্ণনা ইসলামে বিশ্বাসী সমস্ত ওলামাদের দৃষ্টিতেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল- বাকের (আঃ) জনাব জাবেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : 'হে জাবের! আমরা যদি কোন হাদীস আমাদের নিজের থেকে ও আমাদের প্রবৃত্তি থেকে তোমাদের জন্যে বর্ণনা করি তাহলে আমরা ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। কিন্তু (জেনে রেখো) আমরা যতগুলো হাদীস তোমাদের জন্যে বর্ণনা করি তা সমস্তই স্বীয় ভান্ডারের আকারে রাসূল (সাঃ) থেকে তোমাদের জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছি' (জামেউ' আহাদীসুশ্ শীআহ্ খঃ- ১ম, পৃঃ- ১৮, ভূমিকা থেকে, হাদীস নং ১১৬)।

ইমাম জা' ফর ইবনে মুহাম্মাদ আস্- সাদিক (আঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি এসে একটি প্রশ্ন করল। ইমাম তার উ র দিচ্ছিলেন। ঐ লোকটি ইমামের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার জন্যে অন্য আলোচনা শু করল। ইমাম তাকে বললেন : এ সব কথা- বার্তা বাদ দাও। অতঃপর বললেন :

'এ বিষয়ে আমি তোমাকে যে জবাব দিয়েছি তা ছিল রাসূল (সাঃ) থেকে'। (উসূলে কাফি, খঃ- ১ম, পৃঃ- ৫৮, হাদীস ১২১)।

এখানে আর কোন কথা বলার অবকাশ থাকে না।

একটি গু পুর্ণ দিক ও লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এ যে, হাদীসের জগতে আমাদের এখানে নির্ভরযোগ্য কয়েকটি হাদীসের গ্রন্থ রয়েছে। যেমন উসূলে কাফি, "তাহযীব", "আল- ইসতিবসার" ও "মান লা ইয়াহযু ল ফাকীহ"। কিন্তু হাদীস গ্রন্থসমূহ আমাদের নিকট নির্ভরযোগ্য হওয়ার অর্থ এ নয় যে, যত বর্ণনা বা হাদীসই এ গ্রন্থসমূহে আছে সবই আমাদের মতে গ্রহণযোগ্য। এর পাশাপাশি ইলম- ই- রেজালের গ্রন্থও রাখি (যে গ্রন্থে হাদীস বর্ণনাকারীদের হাল- অবস্থা সমস্ত সনদসমূহের ক্রমধারায় বিস্তারিত বর্ণনা হয়েছে)। আমাদের নিকট শুধুমাত্র সে সমস্ত হাদীস বা বর্ণনাই গ্রহণযোগ্যও বিবেচিত- যার সনদের ক্রমধারার ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হবেন। সুতরাং উল্লিখিত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে যদি কোন হাদীস এ শর্ত মোতাবেক না হয় তাহলে আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

অধিকন্ত সম্ভাবনা আছে যে, এমনও বর্ণনা আছে যার সনদের ক্রমধারাও নির্ভরযোগ্য; কিন্তু আমাদের বড় বড় ওলামা ও ফকীহগণ সে হাদীসকে উপেক্ষা করে গেছেন ও এর থেকে মুখ

ফিরিয়ে নিয়েছেন, এ কারণে যে, অন্য কোন বাধা তার মধ্যে পেয়েছেন। এ জাতীয় হাদীসকে আমরা- معرض عليهاতথা "এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে" নামে আখ্যায়িত করেছি এবং আমাদের দৃষ্টিতে এ জাতীয় হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়।

এখান থেকে একটি বিষয় পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যারা আমাদের আকীদা- বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দোষ- ত্রুটি খুঁজে বের করার জন্যে উল্লেখিত গ্রন্থসমূহের কোন কোনটি থেকে শুধুমাত্র এক দু' টি বা কয়েকটি হাদীস নিজের পক্ষে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করে অথচ এর সনদ ইত্যাদি কিছুই যাচাই- বাছাই ও সন্ধান করেনি, তাহলে তারা সঠিক পন্থা অবলম্বন করেনি।

অন্য কথায়, ইসলামী মাযহাবসমূহের অন্যতম প্রসিদ্ধ একটি মাযহাবের কতিপয় হাদীস গ্রন্থ রয়েছে "ছিহাহ্" নামে। যার হাদীসগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে লেখক নিজেই দায়ি নিয়েছেন এবং অন্যরাও এগুলো বিশুদ্ধ বলে সমর্থন করেছে। কিন্তু আমাদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে আমাদের নিকট তদ্রুপ নয়। বরং আমাদের হাদীসের গ্রন্থসমূহ এমন যে, যার লেখকগণ নিজেরাই বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্পন্ন, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্ব । কিন্তু হাদীসের সনদ সংক্রান্ত বিশুদ্ধতার বিষয়টি অর্পিত হয়েছে ইলমে রিজালের কিতাবসমূহে বর্ণনাকারীর সনদের ধারা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করার উপর।

যা হোক আমাদের দৃষ্টিতে কোরআনের আয়াত ও হাদীসে রাসূল আকরাম (সাঃ) এর পর আহলে বাইতের বারজন ইমামের হাদীস নির্ভরযোগ্য। তবে এ জন্যে শর্ত হচ্ছে ইমামগণের হাদীসসমূহ প্রকাশের সূত্র ও পন্থা নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হতে হবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করেছি তা আমাদের আকীদা- বিশ্বাসের মৌলিক দিকগুলোর উপর ছিল। যাতে দ্বীন ইসলামের মূল বিষয়সমূহকে পরিস্কার করে তুলে ধরেছি। এ ছাড়াও আমাদের আকীদা- বিশ্বাসের আরো কিছু দিক আছে সেগুলো এখন আমরা আলোচনা করবো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবিধ বিষয়

৫৬. বুদ্ধি বৃত্তিক সৌন্দর্য ও কদর্যতা :

আমরা বিশ্বাস করি : মানুষ তার বিবেক- বুদ্ধি ও বিচক্ষনতা দিয়ে ভাল- মন্দ, সৌন্দর্য ও কদর্যতা এরূপ অনেক কিছুকেই উপলব্দি করে। আর তা ভাল- মন্দ চেনার ানের মাধ্যমে করে থাকে - যা আল্লাহ্ মানুষকে দান করেছেন। এ কারণেই, এমনকি আসমানী শারীয়াত অবতীর্ণ হবার পূর্বে কোন কোন বিষয় বিবেক- বুদ্ধির দ্বারা মানুষের নিকট স্পষ্ট হত। ন্যায়- ইনসাফ ও সৎকর্মের সৌন্দর্য, জুলুম ও অবিচারের কদর্যতা, অনেক চরিত্র- আখলাক জনিত বৈশিষ্ট্যের সৌন্দর্য। যেমন, সত্য কথা বলা, আমানত বা গচ্ছিত সম্পদের সংরক্ষণ, বীর , দানশীলতা ও এ জাতীয় অন্যন্য গুণাবলী, আবার মন্দ জনিত বৈশিষ্ট্যাবলী যেমন, মিথ্যা কথা বলা, খেয়ানত, কৃপণতা ও এ জাতীয় মন্দ বৈশিষ্ট্যাবলী। আর মানুষের বিবেক- বুদ্ধি সব ক্ষেত্রে সৌন্দর্য ও কদর্যতা অনুধাবন করতে অক্ষম এবং মানুষের ান যেখানে সব সময়ই সীমিত সেখানে খোদার দ্বীন, আসমানী কিতাব ও নবী- রাসূলগণ এ ঘাটতি পূর্ণ করার জন্যে খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন - যাতে করে মানুষের বিবেক- বুদ্ধিগত অনুধাবনের ব্যাপারেও গু আরোপ করবেন এবং এ প্রকারের নানান দিকগুলো যা বিবেক- বুদ্ধি অনুধাবন করতে অক্ষম সেগুলোকেও মানুষের জন্যে পরিস্কার করে দিবেন।

আমরা যদি সত্য ও বাস্তবতা নিরূপণের ক্ষেত্রে বিবেক- বুদ্ধির স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি তাহলে তো এক বাদ, খোদা পরিচিতি, নবীগণের প্রেরণ ও ঐশী দ্বীন এবং মতবাদ সমূহ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে। কেননা, খোদার অস্তিে র প্রমাণ ও বাস্ত বায়ন, নবী- রাসূলগণের আহ্বানের সত্যতা বুঝা বিবেক- বুদ্ধির পথ ছাড়া অন্য কোন পথে সম্ভব নয়। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, ইসলামী শরীয়াতের বর্ণনাবলী ঠিক তখনি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত

হতে পারে যখন এক বাদ ও নবুয়্যতের মত গু পূর্ণ দু' টি মৌলিক বিষয় বিবেক- বুদ্ধির যুক্তি- প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করা যেতে পারে। এ দু' টি বিষয়ের সত্যতার প্রমাণ শুধুমাত্র শারীয়াতের দলীল- প্রমাণ দ্বারা সম্ভব নয়।

৫৭. আল্লাহর আদল্ বা ন্যায়পরায়নতা :

কারণেই আমরা মহান আল্লাহর আদল বা ন্যায়পরায়নতার ব্যাপারে পূর্ণবিশ্বাসী এবং একথা বলে থাকি যে : মহান আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব যে, তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুম বা অবিচার করবেন। বিনা কারণে কাউকে শাস্তি দিবেন অথবা বিনা কারণে কাউকে ক্ষমা করে দিবেন। তাঁর পক্ষে অসম্ভব যে, তিনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা রক্ষা করবেন না। তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় যে, অসৎ ও পাপীদেরকে নিজের পক্ষ থেকে নবুয়্যত ও রিসালতের পদে মনোনয়ন দিবেন ও মু' জিযাহ্ বা আলৌকিক ঘটনা তাঁর অধিকারে দিয়ে দিবেন।

আর এটাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ব্যাপার নয় যে, তাঁর বান্দাদেরকে যেখানে পরম কল্যাণ, সফলতা ও পূর্ণাঙ্গতার শীর্ষে পৌঁছার জন্যে সৃষ্টি করেছেন সেখানে তাদেরকে পথ প্রদর্শক ও নেতাহীন ছেড়ে দিবেন! কেননা, এ কাজ তাঁর পক্ষে বেমানান ও বিশ্রী। আর কদর্য ও বিশ্রী কাজ আল্লাহর জন্যে কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়।

৫৮. মানুষের স্বাধীনতা :

ঠিক একই কারণে আমরা বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ্ মানুষকে স্বাধীনতার অধিকার দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কাজ- কর্ম ও ভূমিকা তার ইচ্ছা ও স্বাধীনতার ভি িতে উৎসারিত হয়। কেননা, যদি এরূপ না হয় অর্থাৎ আমরা যদি মানুষের কাজ- কর্মের বা আমলের ক্ষেত্রে জোর- জবরদস্তির নীতিতে বিশ্বাসী হই তাহলে অসৎকর্মশীল লোকদেরকে শাস্তি প্রদান প্রকাশ্য ও স্পষ্ট অবিচার এবং সৎকর্মশীল লোকদের প্রতি পুরস্কার প্রদান অহেতুক ও নিরর্থক হয়ে দেখা দিবে। আর এ জাতীয় কাজ আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ভিন্ন কিছুই নয়।

সার কথা হচ্ছে যে, বিবেক- বুদ্ধি বৃ ি ক সৌন্দর্য ও কদর্যতার বিষয়টি মেনে নেয়া এবং অনেক সত্য ও বাস্তবতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা ও বিচক্ষণতার বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া দিন ও ইসলামী শারীয়াতের মূল ভি সমূহ, নবী- রাসূলগণের নবুয়্যাত, রেসালত ও আসমানী কিতাবসমূহকে গ্রহণ করে নেয়ারই নামান্তর। কিন্তু আগেও যেমন বলা হয়েছে যে,

মানুষের অবগতি ও উপলব্দি ক্ষমতা সীমিত। এ কারণে, শুধুমাত্র এর দ্বারাই মানুষের মূল লক্ষ্য- কল্যাণ ও পূর্ণাঙ্গতার সাথে সম্পর্ক যুক্ত সমস্ত বাস্তবতা ও সত্যকে উপলব্দি করতে পারেনা। আর এ কারণেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী- রাসূল প্রেরণ ও আসমানী কিতাব অবশ্য প্রয়োজনীয়।

৫৯. ফীকাহ্‌গত মাসায়েল নির্ধারণের একটি উৎস হল, আক্বল :

ইতিপূর্বে যা বলা হলো তার আলোকে আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে যে, ইসলামী জীবন বিধানের আইন- কানুন নির্ধারণের জন্যে যে মৌলিক উৎসগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটি হল আকল (তথা ান- বুদ্ধি ও বিবেক)। অর্থাৎ আক্বল, মাসয়ালা- মাসায়েল নির্ণয়ের আরেকটি দলীল। এখানে আক্বল এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, আকল যখন কোন বিষয়কে নিশ্চিত ও দৃঢ়ভাবে অনুধাবণ করতে পারে তখন সে বিষয়ে বিচার- ফয়সালাও দিতে পারে; যেমন : যদি ধরে নেয়া যায় যে, জুলুম- অত্যাচার, আমানতের খিয়ানত, মিথ্যা কথা বলা, আত্ম হত্যা করা, ধন- সম্পদ চুরি করা, মানুষের হক- অধিকার নস্যাত করা ইত্যাদি হারাম হওয়ার বিষয়টির দলীল কোরআন, হাদীস ও আলেম- ওলামাদের ঐক্যমতের কথা কোথাও খুঁজে না পেতাম; তখন আমরা "আক্বল" এর দলীল দ্বারা ঐ বিষয়গুলোকে হারাম বলে ঘোষনা করতাম; আর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতাম যে, মহা ানী আল্লাহ্‌ এ বিষয়গুলোকে আমাদের জন্যে হারাম হিসাবে গণনা করেছেন এবং এ সমস্ত কাজ আঞ্জাম দিবার ক্ষেত্রে তিনি কখনো রাজি ও সম্মত নন। আর এ (আক্বল দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ) আমাদের জন্যে একটি দলীল বা হুজ্জাত।

আল- কোরআনে অসংখ্য আয়াত আছে যার ব্যখ্যা- বিশ্লেষণে "আকল" এর প্রতি গু আরোপ করা হয়েছে। আর এ আয়াতসমূহ বর্ণনা করছে যে, আকল একটি দলীল।

এক বাদের রাস্তা সন্ধানের জন্যে আল- কোরআন আকল ও বিচক্ষণতাকে আহ্বান জানাচ্ছে যেনো আসমান ও যমীনের সৃষ্টি নিপুনতায় আল্লাহর নিদর্শণাবলীর উপর গবেষণা করে। আল্লাহ্‌ বলেন : 'নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির (নিপুনতার) মধ্যে বিবেকবান লোকদের জন্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী বিদ্যমান' (সূরা : আলে ইমরান- ১৯০)।

অপর পক্ষে আল্লাহর এ নিদর্শনাদি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের বিবেক- বুদ্ধি ও হৃদয়ঙ্গম শক্তিকে বৃদ্ধি করা। যেমন : মহান আল্লাহ্ বলেন : 'লক্ষ্য করে দেখো; আমরা আমাদের নিদর্শনাবলীকে কিরূপে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি- যাতে করে তারা অনুধারন করতে পারে' (সূরা : আনআম ৬৫)।

আরেক পক্ষে সমস্ত মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে যেন মন্দ ও কদর্য থেকে ভাল ও সুন্দরকে পৃথক এবং এ পথে চিন্তা শক্তিকে কাজে লাগায়। যেমন, আল্লাহ্ বলেন :

'তুমি বল! চক্ষু ান ও দৃষ্টি শক্তিহীন (ানী- বি ও অ - জাহেল) লোকেরা কি এক সমান? তোমরা কি চিন্তা- ভাবনা কর না? (আল- আনআম : ৫০)।

অবশেষে সমস্ত সৃষ্টিকুলের মধ্যে নিকৃষ্টতম প্রাণী হিসাবে সে সমস্ত লোকদের গণনা করা হয়েছে - যারা নিজেদের চোখ, কান, জিহ্বা ইত্যাদিকে কাজে লাগায় না এবং বিবেক ও বিচক্ষণতা শক্তি ব্যবহার করে না। যেমন, আল্লাহ্ বলেন :

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম প্রাণী আল্লাহর নিকট সে সমস্ত মুক ও বধির লোকেরা- যারা আক্বল বা বিবেক- বুদ্ধি খরচ করে বুঝার চেষ্টা করে না' (সূরা : আল- আনফাল, আয়াত নং ২২)।

এভাবে আক্বল, বিবেক- বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাকে চিন্তা- ভাবনার মাধ্যমে কাজে লাগানোর ব্যাপারে আল- কোরআনে আরো অসংখ্য- অগণিত আয়াত রয়েছে। এমতাবস্থায় কি করে সম্ভব হতে পারে যে, বিবেক- বুদ্ধি, আক্বল, বিচক্ষণতা ও চিন্তা শক্তিকে ইসলামের মৌলিক ও শাখা- প্রশাখার ক্ষেত্রে অলক্ষে বাদ দেয়া যায়?

৬০. আবারও আল্লাহর আদল :

আগেও যেমন ইংগিত করেছি যে, আমরা আদল বা ন্যায়পরায়নতায় বিশ্বাসী এবং দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি যে, আল্লাহ্ তাঁর কোন বান্দার প্রতি বিন্দুমাত্র অন্যায় ও জুলুম করা বৈধ মনে করেন

না। কেননা, জুলুম কদর্য ও অপছন্দনীয় কাজ। আর আল্লাহর মহান স া এ জাতীয় কাজ- কর্ম থেকে পাক- পবিত্র।

আর আল্লাহ্ বলেন :

'তোমার প্রভু কারো প্রতি জুলুম করেন না' (সূরা : কাহাফ আয়াত নং ৪৯)।

দুনিয়া বা আখেরাতে কেউ যদি কোন শাস্তির মধ্যে লিপ্ত হয় তাহলে তার কারণ সে নিজেই। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

'আল্লাহ্ (পূর্বের জাতী সমূহের যারা- আল্লাহর শাস্তিতে নিপতিত হয়েছিল) তাদের প্রতি কোন অবিচার করেননি বরং তারা নিজেরাই নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করেছিল' (সূরা : তাওবাহ, আয়াত নং ৭০)।

শুধুমাত্র মানুষই নয় বরং কোন সৃষ্টিই এ পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবিচারের শিকারে পরিণত হবে না। আল্লাহ্ বলেন :

'আল্লাহ্ কখনো বিশ্ববাসীর কারো উপর কোন প্রকার জুলুম করতে চান না' (সূরা : আলে ইমরান ১০৮)।

অবশ্য এ সমস্ত আয়াতসমূহ আকলের বিষয়ে গু আরোপ ও দিক নির্দেশনা করছে।

অসাধ্য কাজকর্ম বর্জনীয় :

এ কারণেই আমরা বিশ্বাস করি : যে কাজ সম্পাদন করা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার তা করা বাঞ্ছনীয় নয়। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ বলেন :

'আল্লাহ্ কারো উপর কোন দায়ি চাপিয়ে দেননা কিন্তু যা সে করতে সক্ষম' (সূরা : আল-বাকারাহ, আয়াতনং ২৮৫)।

৬১. বিপদজনক ঘটনাবলীর দর্শন :

একই কারণে আমরা আরো বিশ্বাস করি : এ জগতে যে সমস্ত বিপদজনক ঘটনা সংঘটিত হয়; যেমন ভূমিকম্প ও নানা প্রকার বালা- মুসিবত, সে গুলো কখনো কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে

শাস্তি হিসাবে আসে। এভাবে যে, যেমন হযরত লূত (আঃ) এর জাতি সম্পর্কে কোরআনে এসেছে : 'যখন আমাদের নির্দেশ এসে পৌঁছালো, আমরা তাদের শহরগুলোকে (আবাদি গুলোকে) উলোটপালোট করে দিলাম এবং তাদের উপর মুষলধারে ঝামা পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলাম' (সূরা : হুদ আয়াত নং ৮২)।

অকৃত বিদ্রোহী লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

'তারা (আল্লাহর আনুগত্যতার ব্যাপারে) অবাধ্যতা করলো, সুতরাং আমরা তাদের প্রতি ধংসকারী াবন পাঠালাম' (সূরা : আস সাবা, আয়াত নং ১৬)।

এভাবে দূর্যোগপূর্ণ ঘটনাবলীর আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে জাগ্রত করা- যাতে করে তারা সঠিক পথে ফিরে আসে। আল্লাহ্ বলেন :

'স্থলভাগ ও জলভাগে যে সমস্ত ধবংসলীলা ও দূর্যোগ ছড়িয়ে পড়ছে তা এ কারণে যে তারা নিজেরা নিজেদের কৃতকর্ম দ্বারা অর্জন করেছে। আর আল্লাহ্ চাচ্ছেন যে, তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কিয়দাংশের স্বাদ আস্বাদন করাবেন; তাতে হয়তো তারা (মন্দ থেকে) ফিরে আসবে' (সূরা : আর রোম, আয়াত নং ৪১)।

বিপদজনক ঘটনাবলীর আরেকটি দিক হচ্ছে এমন সব বালা- মুছিবত- যা মানুষ নিজের হাতে নিজেই যোগান দেয়। অন্য কথায়, এ সব বালা- মুছিবত তাদের নিজেদেরই কৌশলহীন ও অযৌক্তিক কৃতকর্মের পরিণতি। আল্লাহ্ বলেন :

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন আনয়ন করে' (আর রাদ : ১১)। আল্লাহ্ বলেন :

'তোমাদের প্রতি যে কল্যাণ ও সফলতা এসে উপস্থিত হয় তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে, আর অমঙ্গল ও বিপদাপদ যা কিছু আসে সেগুলো তোমাদের নিজেদেরই (মন্দ কর্মের) পরিণতি' (সূরা : আন- নিসা, আয়াত নং ৭৯)।

৬২. বিশ্ব- জাহান সুবিন্যস্ত :

আমরা বিশ্বাস করি : সমস্ত সৃষ্টি জগতই সুবিন্যস্ত ভাবে সাজানো এক অনুপম পরিবেশ। সব কিছু প্রয়োজন মোতাবেক সুশৃংখলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কোথাও কোন বিষয়ই ন্যায়- নিষ্ঠা, ইনসাফ ও কল্যাণ বিরোধী দেখা যায় না। আর মানব সমাজে যদি কোন প্রকার অকল্যাণকর ও মন্দ পরিবেশ দেখা যায় তাহলে তা মানুষদের নিজেদেরই সৃষ্টি।

আবারও বলছি, আমরা বিশ্বাস করি : আল্লাহর আদল বা ন্যায় পরায়নতা আমাদের আকীদা-বিশ্বাসের অন্যতম একটি স্তম্ভ ও ভি । এটা ব্যতীত এক বাদ, নবুয়্যত ও পরকালের বিষয়টিও হুমকীর সন্মুখীন। এ পর্যায়ে ইমাম জা' ফর ছাদিক (আঃ) বলেন : "এক বাদ ও আল্লাহর আদল হচ্ছে দ্বীনের মৌলিক ভি '। এরপর তিনি আরো বললেন : 'তাওহীদ বা এক বাদ হচ্ছে, যে সব জিনিষ (অন্যায় কাজ) তোমার জন্যে করা সম্ভব (অর্থাৎ তোমার মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্যাবলী পাওয়া যায়) সেগুলো তোমার প্রভুর মধ্যে পাবে না। (তিনি সে সব থেকে পাক ও পবিত্র) কিন্তু আল্লাহর আদল হচ্ছে এমন কোন কাজ খোদার প্রতি সম্পর্কযুক্ত ও আরোপ করনা- যা তুমি নিজে যদি আঞ্জাম দাও তাহলে তোমাকে সে কাজের জন্যে তিরস্কার করা হবে' (বিহা ল আনোয়ার, খঃ- ৫ম, পৃঃ- ১৭, হাদীস নং ২৩)।

৬৩. ফীকাহগত মাসায়েল নির্ধারনের চারটি উৎস :

আমাদের ফীকাহগত মাসয়ালা- মাসায়েল নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আগেও যেমন ইশারা করেছি যে, এ পর্যায়ে আমাদের চারটি উৎস স্থল রয়েছে :

প্রথম : "কিতাবুল্লাহ্" বা আল্লাহর কিতাব আল- কোরআন- যা ইসলামের ান- বি ান ও শিক্ষা-দীক্ষা এবং হুকুম- আহকাম নির্ণয়ের মূল উৎস।

দ্বিতীয় : "সুন্নাতে রাসূল" ও "আহলে বাইতের মা'সুম ইমামগণের সুন্নাত"।

তৃতীয় : "ইজমা ও ইে ফাকে ওলামা ও ফোকাহা" যা মা'সুমগণের দৃষ্টিভঙ্গিকেই উন্মোচন ও প্রকাশ করে।

চতুর্থ : "দলীলে আক্বল"। দলীলে আক্বলের দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আকল যখন কোন বিষয় পরিপূর্ণ রূপে অনুধাবন করতে পারে এবং নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তার সাথে ফয়সালা দিতে পারে তখন আকল আমাদের জন্যে দলীল ও হুজ্জাত। কিন্তু আক্বলের দলীল যদি ধারণা প্রসূত হয় যেমন "কিয়াস" ও "ইসতেহসান" তাহলে আমাদের ফীকাহগত মাসয়ালা- মাসায়েলের কোন একটির ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। এ কারণে যে, কোন ফকীহ যখন নিজের ধারণার উপর ভি করে কোন বিষয়কে কল্যাণকর হিসাবে দেখে অথচ কোরআন ও হাদীসে যে ব্যাপারে কোন নির্দেশ আসেনি, তাহলে এ ধরণের দলীলে আক্বলীকে আল্লাহর হুকুম হিসাবে বলতে পারেন না। অনুরূপভাবে ধারণা প্রসূত কিয়াসের আশ্রয় নেয়া শারীয়াতের হুকুম- আহকাম নির্ণয়ের জন্যে আমাদের নিকট বৈধ নয়। কিন্তু মানুষ যেসব ক্ষেত্রে দৃঢ়তা অর্জন করবে, যেমন জুলুম করা, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, খিয়ানত করা ইত্যাদি পর্যায়ে আক্বলের দলীল নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর তা এ দাবীর ভি তে : আক্বল যা হুকুম করে শারীয়াতের নির্দেশ ও তাই তথা আক্বল শারীয়াতের হুকুমেরই বর্ণনাকারী।

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আমরা হুকুম- আহকাম ও বিধি- বিধান সম্পর্কে "মুকাল্লাফদের" (যাদের উপর শারীয়াতের হুকুম পালন অপরিহার্য কর্তব্য) প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাদের ইবাদতগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিষয়াবলীর পর্যায়ে রাসূলে আকরাম (সাঃ) ও মা'সুম ইমামগণের কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমান হাদীস ও বর্ণনা আমাদের হাতে রয়েছে। কাজেই এ জাতীয় ধারণা জনিত দলীল- প্রমাণের আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমরা দেখতে পাই না। এমনকি আমরা বিশ্বাস করি যে, কালের আবর্তনের কারণে নব উদ্ভাবিত বিষয়াবলীর হুকুম- আহকাম বের করার জন্য কোরআন ও রাসূল (সাঃ) এবং মা'সুমগণের হাদীস ও বর্ণনাগুলোতে মূলনীতি ও সামগ্রিক দিকগুলো বর্তমান রয়েছে- যা আমাদেরকে ধারনা জনিত দলীল- প্রমাণ থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়।

৬৪. ইজতিহাদের দরজা সব সময় উ ু :

আমরা বিশ্বাস করি : ইজতিহাদের দরজা শারীয়াতের সমস্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সব সময়ের জন্যে উন্মুক্ত এবং মতামতদানে যোগ্যতা সম্পন্ন সমস্ত ফকীহগণ আল্লাহর হুকুম-আহকামসমূহকে উল্লেখিত চারটি উৎস থেকে বের করতে পারেন। আর তা সে সমস্ত মানুষদের হাতে দিবেন যাদের মাসয়ালা-মাসায়েল নির্ণয় করার যোগ্যতা নেই। যদিও তা পূর্ববর্তী ফকীহগণের মতামতের সাথে তফাৎ পরিলক্ষিত হয়। আমরা বিশ্বাস করি যে সমস্ত লোক ফীকাহগত মাসয়ালা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে মতামতদানের যোগ্যতা সম্পন্ন নয় তাদেরকে সব সময় সে সমস্ত জীবিত ফকীহগণের কাছে যেতে হবে যাঁরা স্থান-কাল ও পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে হুকুম-আহকাম সম্পর্কে াত এবং তাঁদের ফতোয়া মোতাবেক আমল করবে। যারা ফীকাহ্ শাস্ত্রে পণ্ডিত নন তারা যেন অবশ্যই যারা এ বিষয়ে পাণ্ডি অর্জন করেছেন তাদেরকে জু করে বা তাদেরকে তাকলীদ করে। আর তাদেরকে ফীকাহ্ শাস্ত্রের পণ্ডিতদের সাথে যোগাযোগ করাকে একটি স্বতঃসিদ্ধ কাজ বলে জানি। আমরা এ সমস্ত ফকীহগণকে "মার্যায়ে তাকলীদ" নামে স্মরণ করে থাকি। মৃত ফকীহর উপর তাকলীদের সূচনাকে জায়েয মনে করি না। অবশ্যই মানুষদেরকে জীবিত ফকীহর উপর তাকলীদ শু করতে হবে - যাতে করে ফীকাহ্ শাস্ত্র সব সময় আন্দোলিত ও পূর্ণতার দিকে এগুতে থাকে।

৬৫. ইসলামে কোন বিষয়ই বিধানহীন নেই :

আমরা বিশ্বাস করি : ইসলামে এমন কোন বিষয় নেই যার আইন-কানুন ও বিধি-বিধান অবর্তমান। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়াবলীর হুকুম-আহকাম কিয়ামত পর্যন্ত সময়-কালের জন্যে বর্ণিত হয়েছে - যা কখনো বিশেষভাবে আবার কখনো সাধারণ ও সামগ্রিকভাবে বা কোন বিষয়ের প্রসঙ্গক্রমে। এ কারণেই আমরা কোন ফকীহর আইন প্রণয়নের অধিকারে বিশ্বাসী নই। বরং তাঁদের দায়ি -কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর আইন-কানুনকে উল্লিখিত চারটি উৎস থেকে

নির্ণয় ও বের করবে এবং তা সমস্ত মানুষের অধিকারে ছেড়ে দিবেন। আর কোরআন মজীদে কি আল্লাহ্ এ কথা বলেননি যে,

'আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের জন্যে আমাদের নেয়ামতকে সম্পন্ন করলাম এবং ইসলামকেই তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' (সূরা : আল- মায়েদাহ, আয়াত নং ৩)।

তা না হলে ইসলামী জীবন বিধান কেমন করে পূর্ণতা লাভ করতে পারতো, যদি ফীকাহগত হুকুম- আহকামসমূহ সর্বকালের ও সর্বযুগের জন্য পূর্ণাঙ্গ না থাকতো? আমরা কি এ হাদীসটি পাঠ করি না, যা রাসূল (সাঃ) বিদায় হজ্জের সময় বলেছেন : 'হে লোক সকল! আল্লাহর শপথ, যে সব বিষয় তোমাদেরকে বেহেশ্তের নিকটবর্তী ও দোযখের আগুন থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছি। আর যে কাজ তোমাদেরকে নরকের নিকটবর্তী করবে ও স্বর্গ থেকে দূরে সরিয়ে দিবে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছি' (উসূলে কাফী ২য় খ :, পৃঃ ৭৪, বিহা ল আনোয়ার ৬৭তম খঃ, পৃঃ নং ৯৬)।

ইমাম জা' ফর সাদিক (আঃ) বলেন : 'হযরত আলী (আঃ) ইসলামী হুকুম- আহকামের কোন কিছুই বাদ দিয়ে যাননি, লিখে রাখা ব্যতীত। (রাসূল (সঃ) এর নির্দেশ ও তাঁর বলা বক্তব্য মোতাবেক। এমনকি নখের আচড়ের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতের রক্তমূল্যের বিষয়টিও (লিখে গেছেন)' (জামেউল আহাদীস, খঃ- ১ম, পৃঃ- ১৮, হাদীস নং ১২৭, এ ছাড়াও আরো বহু সংখ্যক হাদীস উক্ত গ্রন্থে এ পর্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে)।

এতো সব আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার পরও ধারণা প্রসূত, কিয়াস ও ইসতেহসানের মত দলীল- প্রমাণের অবকাশ আর থাকে কোথায়?

৬৬. তাকিয়্যা ও তার দর্শন :

আমরা বিশ্বাস করি : যখন কোন লোক একদল গোঁয়ার, যুক্তিহীন ও স্বদলীয় বিশ্বাসে অন্ধ লোকের মাঝখানে আটকা পড়ে যায়, আর তাদের মাঝে নিজের আকীদা- বিশ্বাসের প্রকাশ

জীবনের হুমকী হয়ে দাঁড়ায় অথবা এ জাতীয় অন্য কোন পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়, আর সেখানে আকীদা- বিশ্বাসের প্রকাশ দ্বারা গু পূর্ণ তেমন কোন কল্যাণও অর্জিত না হয় তাহলে এমন পরিস্থিতিতে তার কর্তব্য- কাজ হচ্ছে নিজের আকীদা- বিশ্বাসের কথা গোপন রাখা এবং নিজের জীবনকে অহেতুক ধবংস না করা। এরই নাম হচ্ছে "তাকিয়্যা" এ বিষয়টি আল- কোরআনের দু' টি আয়াত ও বিবেক বুদ্ধিগত দলীলের ভি িতে আমরা অনুসরণ করি। আল্লাহ্ আলে ফিরাউনের মধ্যে যারা মু' মিন ছিল তাদের সম্পর্কে এরূপ বলেন :

'(ফেরাউনের বংশধরদের এক পরামর্শ সভায়), ফেরাউনের বংশধরেরই এক মুমিন ব্যক্তি যিনি এতদিন পর্যন্ত নিজের ঈমানের কথা গোপন করে আসছিলেন (হযরত মূসা (আঃ) এর রক্ষা কল্পে ফুলে উঠলেন এবং) বললেন : তোমরা কি একজন মানুষকে শুধুমাত্র এ কথার জন্যে হত্যা করতে চাও যে বলে : আমার প্রভু আল্লাহ। অথচ তিনি তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে স্পষ্ট নিদর্শনাদি সহ এসেছেন?' (সূরা : আল- মুমিন আয়াত নং ২৮)।

কোরআনে ব্যবহৃত এ পরিভাষা : يكتم ايمانه 'নিজের ঈমানের কথা গোপন রেখেছিলেন'। তাকিয়্যার বিষয়টিকে এখানে স্পষ্ট করে দিচ্ছে। আলে ফেরাউনের এ মু'মিনের জন্যে কি সংগত ছিল, এভাবে নিজের ঈমানের কথাটি প্রকাশ করে দিবে এবং নিজের জীবনকে সোপর্দ করে দিবে, আর নিজের কাজের অগ্রগতির পথ রোধ করে দিবে?

ইসলামের প্রথম দিকে কোন কোন সংগ্রামী ও মুজাহিদ- মুমিন সম্পর্কে, যে গোড়া মুশরিকদের থাবার মুঠোয় ছিল, তাকে তাকিয়্যা করার নির্দেশ প্রদান করা হল এবং বলা হল : 'মুমিন লোকদের উচিৎ নয় যে, মু' মিনদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে বেছে নিবে; যে ব্যক্তি এ কাজটি করবে সে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কের ছিন্নতা ঘটিয়েছে। কিন্তু সে অবস্থা ব্যতীত (যখন বিপদজনক পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করবে) তখন তাদের সাথে তাকিয়্যার নীতি অবলম্বন করবে' (সূরা : আলে ইমরান, আয়াত নং২৮)।

অতএব, "তাকাইয়্যা" অর্থাৎ আকীদা- বিশ্বাসের কথা গোপন করার বিষয়টি সে সমস্ত স্থানের সাথে নির্দিষ্ট, যেখানে মানুষের জান- মাল ও মান- ইজ্জত একদল গোঁয়ার যুক্তিহীন ও স্বদলীয়

আকীদার অন্ধ বিশ্বাসী লোকদের মাঝে হুমকীর সন্মুখীন হয়। আর সেখানে ঈমানের প্রকাশ দ্বারা কোন সুফলও হাতে আসার অবস্থা নেই, এমন সব পরিস্থিতি ও পরিবেশে ঈমানদার লোকদেরকে অহেতুক নিজের জীবনকে বিপদের সন্মুখে ঠেলে দেয়া উচিৎ হবে না। বরং প্রয়োজনীয় সময়ের জন্যে সংরক্ষণ করা কতর্ব্য- কাজ। এ পযার্য়ে ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বলেন :অর্থাৎ 'তাকিয়্যা হচ্ছে মু' মিনের আত্মরক্ষা মূলক ঢাল' (অসায়েল ১১শ খঃ, পৃঃ নং ৪৬১ হাদীস নং ৬, ৪৪ অধ্যায়)।

কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে :

পৃথিবীতে আল্লাহর ঢ়াল। তাকাইয়্যাহকে "ঢাল" নামে আখ্যায়িত করে ইমাম বুঝিয়ে দিলেন যে, শত্রুর মোকাবেলায় (প্রয়োজন) আত্মরক্ষার একটি হাতিয়ার হচ্ছে তাকিয়্যা।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) এর মুশরিকদের মোকাবিলায় তাকিয়্যা করা এবং রাসূল (সাঃ) কর্তৃক তা অনুমোদিত হওয়া একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা।

এ হাদীসটি বহু সংখ্যাক মুফাস্সির ঐতিহাসিক ও হাদীসবে াগণ নিজেদের বিখ্যাত গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ করেছেন। যেমন : জনাব ওয়াহেদী তাঁর "আসবাবুন- নূযুলে" তাবারী, কোরতবী, যামাখশারী, ফাখ দ্বীন রাযী, বায়যাভী, নিশাবুরী প্রমূখ অনেকেই তাঁদের নিজেদের তাফসীর গ্রন্থে সূরা আন নাহ এর ১০৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লেখ করেছেন।

যুদ্ধের ময়দানে সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্রের মওজুদ গোপন রাখা- যাতে করে শত্রুপক্ষ অবগত হতে না পারে, এ জাতীয় আরো অনেক ব্যাপার আছে- যা গোপন রাখা দরকার, এ সমস্তই মানুষের জীবনে এক প্রকার তাকিয়্যা হিসাবে পরিগণিত। মোট কথা "তাকিয়্যা" অর্থাৎ এমনসব স্থানে নিজের বিশ্বাসের কথা গোপন রাখা যেখানে প্রকাশ করলে পরে তা বিপদের কারণ হিসাবে দেখা দিবে এবং গোপন রাখা অতিব জ রী । আর প্রকাশের দ্বারা কোন কল্যাণও বয়ে আনবে না। এটা একটা বিবেক- বুদ্ধিগত শারয়াতী ব্যাপার। যা শুধুমাত্র শিয়ারাই নয় বরং বিবেকবান যে কোন, মতাবলম্বীই হোক না কেন অবশ্যই এ নীতি অনুসরণ করে চলবে।

এমতাবস্থায় অতি আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কোন কোন লোকেরা এ তাকিয়্যা নীতি অবলম্বনকে কেবলমাত্র শিয়া ও আহলে বাইতের অনুসারীদের জন্যে নির্দিষ্ট মনে করে এবং এটি তাঁদের একটা বড় আকারের আপি কর বিষয় হিসাবে উপস্থাপিত হয়। অথচ বিষয়টি অতিশয় স্পষ্ট ও পরিস্কার। বস্তুতপক্ষে এর উৎস মূল হচ্ছে আল- কোরআন, হাদীস, রাসূল (সাঃ) এর সাথী ও বন্ধুদের নীতি- পদ্ধতি এবং জগৎ ব্যাপি বুদ্ধিমান ও ানী লোকদের কর্মসূচী।

৬৭. যে সকল ক্ষেত্রে তাকিয়্যা হারাম :

আমরা বিশ্বাস করি : শিয়াদের সম্পর্কে ভুল- বুঝাবুঝির মূল কারণ হচ্ছে শিয়াদের আকীদা- বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকা। অথবা তাঁদের আকীদা- বিশ্বাসের বিষয়টি তাদের শত্রুদের কাছ থেকে নেয়া। আশাকরি উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গেছে।

অবশ্য, এ কথা অস্বীকার করার অবকাশ নেই যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাকাইয়্যাহ করা হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ। আর তা হচ্ছে সেই সব স্থানে যেখানে যেখানে দ্বীন ও ইসলামের মূল ভি , কোরআন অথবা ইসলামের সুন্দর বিধি- বিধান হুমকীর সন্মুখীন হয়। এ জাতীয় পরিস্থিতি ও পরিবেশে নিজের আকীদা- বিশ্বাসকে প্রকাশ করতে হবে। তাতে যদি নিজেকে আত্মোৎসর্গও করতে হয়।

আমরা বিশ্বাস করি কারবালায় আশুরার দিন ইমাম হোসাইন (আঃ) এর খে দাঁড়ান ও শাহাদাত বরণ ঠিক এ উদ্দেশ্যেই ছিল। কেননা বনী উমাইয়্যা বংশের শাসকরা ইসলামকে এক বিপদজনক অবস্থায় নিয়ে উপনীত করেছিল। ইমাম হোসাইন (আঃ) এর বিল্পব ও আত্মোৎসর্গ উমাইয়্যাদের কৃতকর্মের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছে এবং ইসলামকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

৬৮. ইসলামী ইবাদতসমূহ :

আমরা কোরআন ও হাদীসে গু ারোপকৃত সমস্ত ইবাদতসমূহের প্রতি আস্থাশীল ও বাধ্যগতভাবে অনুসরণকারী। যেমন দৈনিক পাচঁ ওয়াক্তের নামায যা আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে

সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে গু পূর্ণ ভূমিকা রাখে, রমজান মাসের রোজা যা ঈমানের শক্তিবৃদ্ধি, আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া- পরহেযগারী ও প্রবৃি পুজার বি দ্ধে মোকাবেলা করার উ ম উপায়। কা' বা ঘরের হর করা যা খোদাভী তা ও পরস্পরের প্রতি ভালবাসাকে দৃঢ় করে এবং মুসলমানদের মান- সন্মান উচ্চতর করার কারণ; তা খরচ বহনে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্যে জীবনে একবার (হর করা) ফরয বলে জানি। মালের যাকাত, খুমস্, সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজে নিষেধ এবং ইসলাম ও মুসলমানদের আগ্রাসন ও হামলাকারীদের বি দ্ধে জিহাদ করা স্বতঃসিদ্ধ ফরয হিসাবে গণ্য করি।

যদিও এসব বিষয়সমূহে আংশিক পার্থক্য আমাদের ও অন্য ফেরকার অনুসারীদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। যেমন, পরিলক্ষিত হয় আহলে সুন্নাতের চার মাযহাবের ইবাদতের অনুষ্ঠানাদির মাঝে এবং এছাড়া বড় ধরনের কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

৬৯. দুই ওয়াক্ত এর নামায এক সাথে পড়া :

আমরা বিশ্বাস করি : যোহর ও আছরের নামায এবং মাগরিব ও এশার নামায একসাথে একই ওয়াক্তে পড়ার ব্যাপারে কোন বাধা নেই (যদিও প্রত্যেক নামাযই আলাদা ও পৃথক পৃথকভাবে পড়াকে উত্তম ও ফজিলতের কাজ বলে জানি)। আর বিশ্বাস করি যে, দু'নামাযকে এক সাথে পড়ার ব্যাপারে রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর পক্ষ থেকে সে সমস্ত লোকদের অবস্থার প্রতি বিবেচনা করে অনুমতি দিয়েছেন- যারা কষ্টে আছে।

ছহীহ্ তিরমিযিতে ইবনে আনাস (রাঃ) থেকে এভাবে বর্ণিত আছে : 'হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) মদীনাতে যোহর ও আছরের নামাযকে এবং মাগরিব ও এশার নামাযকে এক সাথে পড়েছেন অথচ তখন না কোন ভয়ের কারণ ছিল আর না বৃষ্টি। লোকেরা ইবনে আনাসকে জিজ্ঞাসা করলেন : এ কাজের দ্বারা রাসূলে আকরাম (সঃ) এর উদ্দেশ্য কি ছিল? তিনি বললেন : এ জন্যে যে, তিনি চাইলেন তাঁর উম্মতকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন না' (অর্থাৎ যে সব ক্ষেত্রে পৃথক করলে লোকদের বেশী কষ্ট হবে সে ক্ষেত্রে এ সুযোগের স্বদ্ব্যবহার করবে)। (সুনানে তিরমিযি ১ম খঃ, পৃঃ নং ৩৫৪, অধ্যায়- ১৩৮, সুনানে বায়হাকী ৩য় খ : পৃঃ নং ৬৭।)

বিশেষতঃ আজকের আমাদের এ যুগে যেখানে সমাজ জীবনে বিশেষ করে কল- কারখানায় ও শিল্প বিষয়ক কেন্দ্রগুলোতে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পৃথক হওয়ার কারণে অনেকেই নামাযকে পুরোপুরিভাবে ত্যাগ করছে। এমতাবস্থায় রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর এ কাজ ও কথার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে লোকেরা আরো অধিকতর নামাযের প্রতি দৃঢ় ও স্থায়ী হতে পারে। একটু ভেবে দেখুন।

৭০. মাটির উপর সেজদা করা :

আমরা বিশ্বাস করি : নামাযের সেজদা করার সময় মাটিতে অথবা মাটির অংশ বিশেষের উপর কিংবা সেই সব বস্তুর উপর যা জমীন থেকে গজায় (বৃক্ষলতা ইত্যাদি) তার উপর সেজদা করতে

হবে। যেমন গাছের পাতা, কাঠ ও সবরকমের লতা পাতা গু , ঘাস, উদ্ভিদ ইত্যাদির উপর। (তবে খাবারযোগ্য বা পরিধানযোগ্য জিনিষ ব্যতীত)।

এ কারণে আমরা কার্পেটের উপর নামায পড়া জায়েজ মনে করি না। বিশেষ ভাবে আমরা মাটির উপর সেজদা করাকে অন্য সব কিছুর চাইতে প্রাধান্য দেই। এ জন্যই অনেক শিয়াগণই সহজ-সুবিধার জন্যে ছাঁচে ঢালাই করা এক খন্ড পাক- পবিত্র মাটি নিজেদের সাথে রাখেন এবং নামাযের সময় তাতে সেজদা করেন- যাকে আমরা মুহর বলি।

এ পর্যায়ে আমরা রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর এ প্রসিদ্ধ হাদীসকে দলীল হিসাবে উপাস্থাপন করি। রাসূল (সাঃ) বলেন : 'যমীনকে আমার জন্যে "মাসজিদ" (সেজদার জায়গাহ্) ও "তাহুরান" তাইয়াম্মুমের পাত্র) বানানো বা নির্দিষ্ট করা হয়েছে'।

এ হাদীসে ব্যবহৃত "মাসজিদ" শব্দটির অর্থ আমরা "সেজদার স্থান" হিসেবে ব্যবহার করেছি।

এ হাদীসটি ছিহাহ্ সি াহ্ এর অধিকাংশ হাদীসগ্রন্থ ছাড়া আরো বহু কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। ছহীহ্ বোখারী ১ম খঃ, পৃঃ নং ৯১, তাইয়াম্মুমের অধ্যায়ে জনাব জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ আনছারী থেকে বর্ণিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে সুনানে নাসাঈতেও উল্লেখিত রাবী থেকে বাবুত তায়াম্মুম বিস সাঈদ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। (মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল ১ম খ : পৃঃ নং ৩০১।) জনাব ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। এবং শিয়া মাযহাবের উৎসগুলিতেও বিভিন্ন মাধ্যমে রাসূল আকরাম (সাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

সম্ভাবনা আছে যে, কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, এ হাদীসে "মাসজিদ" শব্দের অর্থ "সেজদার স্থান" নয় বরং "নামাযের স্থান", সে সমস্ত লোকদের বিপরীতে- যারা শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট স্থানে নামায পড়ে। কিন্তু এর মধ্যে "তাহুরান" তথা "তায়াম্মুমের মাটি" কথাটি এসে স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, এখানে "মাসজিদ" কথাটির অর্থ সেজদার স্থান। অর্থাৎ পৃথিবীর মাটি পবিত্র এবং সিজদার স্থানও।

এ ছাড়াও আহলে বাইতের ইমামগণের কাছ থেকেও বহু সংখ্যক হাদীস রয়েছে যা মাটি, পাথর ও এ জাতীয় অনেক কিছুকে সেজদার স্থান বলে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন।

৭১. নবী- রাসূল ও ইমামগণের কবর যিয়ারাত :

আমরা বিশ্বাস করি : হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর আহলে বাইতের ইমামগণের, বি ওলামাদের ও খোদার পথে শহীদদের কবর যিয়ারত করা তাকিদকৃত মুস্তাহাব। আহলে সুন্নাতের ওলামাদের গ্রন্থাবলীতে রাসূল (সাঃ) এর কবর যিয়ারত সম্পর্কিত অসংখ্য হাদীস লিপিবদ্ধ আছে; যেমনভাবে শিয়া ওলামাদের গ্রন্থাবলীতে ও এ সম্পর্কে হাদীস উল্লেখ রয়েছে। যদি এ সমস্ত হাদীসসমূহকে সংগ্রহ করে একত্রে একটি গ্রন্থ সংকলন করা হয় তাহলে বেশ বড় ও স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থের আকার ধারণ করবে। (এ সমস্ত হাদীসসমূহ জানার জন্যে এবং এ পর্যায়ে বড় বড় ওলামাদের বক্তব্য ও তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগতির জন্য আল গাদীর গ্রন্থের যিয়ারত অধ্যায় পাঠ ক ন, (আল- গাদীর, ৫ম খঃ, পৃঃ ৯৩- ২০৭)।

ইতিহাসের এ দীর্ঘ পাতায় ইসলামের ওলামাবৃন্দ, সর্বস্তরের ও সর্ব শ্রেণীর মানুষ এ কবর যিয়ারতের উপর গু প্রদান করে আসছেন। ইসলামী বই- পুস্তক ও গ্রন্থাবলীতে সে সমস্ত লোকদের হাল- অবস্থা বিস্তারিত ও বিশদভাবে লিখিত আছে- যাঁরা রাসূলে আকরাম (সাঃ) ও সমস্ত বিশেষ ব্যক্তিদের কবর যিয়ারতে গমনাগমন করতেন।

(এ হাদীসসমূহ সম্পর্কে এবং বড় বড় ওলামাগণের এ পর্যায়ে বক্তব্য ও তাঁদের নিজেদের অবস্থা যেয়ারত পর্যায়ে কি ছিল তা জানার জন্যে পূর্বোল্লেখিত উদ্ধৃতি গ্রন্থ দেখুন)।

মোট কথা বলা যেতে পারে যে, এ বিষয়টি মুসলমানদের সকল দল ও ফেরকার ঐকমত্য ও সর্ব সম্মত বিষয়।

স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার হচ্ছে, কারো পক্ষেই উচিৎ হবে না "যিয়ারত"কে ইবাদতের সাথে ভুল করে বসা। ইবাদত ও উপাসনা কেবলমাত্র খোদার জন্যেই নির্দিষ্ট। আর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান ব্যক্তি গণের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করা এবং মহান আল্লাহর দরবারে তাঁদের থেকে সুপারিশ প্রার্থনা করা। এমনকি বিভিন্ন হাদীসে দেখা যায়, স্বয়ং রাসূলে আকরাম (সাঃ) নিজেই মাঝে মাঝে জান্নাতুল বাকীতে যিয়ারত করতে যেতেন এবং কবরবাসীদের প্রতি সালাম ও দ দ

পাঠাতেন। এ হাদীসটি ছহীহ্ মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, ছহীহ্ তিরমিযি ও সুনানে বায়হাকী গ্রন্থে সমূহে দেখুন।

অতএব, কারোই পক্ষে উচিৎ নয় বা কারো অধিকারও নেই ফীকাহগত দৃষ্টিকোন থেকে এ কাজটি যে শারীয়াত সম্মত তাতে সন্দেহের অবকাশ প্রবেশ করানো।

৭২. শোকানুষ্ঠান পালন ও তার দর্শন :

আমরা বিশ্বাস করি : ইসলামের মহান শহীদদের জন্যে শোক- দুঃখ প্রকাশ করার বিষয়টি বিশেষতঃ কারবালার শহীদদের জন্যে শোক- দুঃখ প্রকাশের কারণ হচ্ছে তাঁদের স্মরণকে জিইয়ে রাখা এবং ইসলামকে রক্ষার জন্যে তাদের ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের সংস্কৃতিকে ধরে রাখা । এ উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন সময়ে বিশেষভাবে আশুরার দিনগুলোতে (মুহাররামের প্রথম দশ দিন) যা হযরত হোসাইন ইবনে আলী (আঃ) এর শাহাদাতের সময়- কাল ছিল, শোকানুষ্ঠান পালন করি। তিনি সেই ইমাম হোসাইন- যিনি বেহেশতের যুবকদের সরদার। রাসূল (সাঃ) বলেন : অর্থাৎ 'ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন বেহেশতের যুবকদের সরদার' (ছহীহ্ তিরমিযিতে আবু সাঈদ খুদরী ও জনাব হোযাইফাহ্ থেকে বর্ণিত, ২য় খঃ, পৃঃ নং৩০৬- ৩০৭, ছহীহ্ ইবনে মাজাহ, ফাযায়েলে আছহাবে রাসূলিল্লাহ্ অধ্যায়ে; মুস্তাদরাকুছ ছহীহহাইন, হুলইয়াতুল আওলিয়া, তারিখে বাগদাদ, আছাবিয়া ইবনে হাজার, কানযুল ওম্মাল, যাখায়ে ল উকবা এবং আরো বহু গ্রন্থাবলীতে হাদীসটি উল্লেখ রয়েছে)।

আমি ল মু' মিনীন হযরত আলী (আঃ) ও রাসূল কন্যা ফাতিমা যাহরার প্রাণ প্রিয় সন্তান। তাঁর জন্যে আমরা শোখ- দুঃখের অনুষ্ঠান পালন করি। এ সব অনুষ্ঠানে আমরা তাঁদের জীবন ইতিহাস ও তাঁদের বীরে র বিশ্লেষণ করি। আর তাঁদের লক্ষ্য- উদ্দেশ্যকে মানুষের সামনে তুলে ধরি এবং তাঁদের পাক- পবিত্র আত্মা সমূহের প্রতি দরূদ পাঠাই।

ইমাম হোসাইন ইবনে আলী (আঃ) ৬১ হিজরী সালের মুহাররাম মাসে সে লম্পট ইয়াযীদের বি দ্ধে খে দাঁড়ালেন- যে ছিল পাপ- পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত এক হীন প্রকৃতির লোক। ইসলাম

সম্পর্কে না তার কোন ধারণা ছিল আর না সে ইসলামকে পছন্দ করত। দুঃখজনকভাবে এহেন এক চরিত্রহীন মদ্যপ ইসলামী খেলাফতের মুসনাদ দখল করে নেয়। যদিও ইমাম হোসাইন (আঃ) ও তাঁর সাথী- বন্ধুগণ ইরাকের কারবালা প্রান্তরে শহীদ হয়েছেন এবং তাঁর পরিবারের (রাসূল পরিবারের) নারীগণকে বন্দি করে বিভিন্ন শহরে শহরে ঘুরিয়েছে। কিন্তু তাঁদের শাহাদাতের রক্ত সে কালের মুসলমানদের মধ্যে আশ্চার্য উে জনার সৃষ্টি করেছিল। এরপর থেকে একের পর এক উমাইয়্যাদের বি দ্ধে যে সব বিদ্রোহের দাবানল রলে উঠল এবং তাদের অন্যায়- অবিচারের প্রাসাদের দোর গোড়ায় মারাত্মক আঘাত হেনে গুঁড়িয়ে দিতে লাগল। পরিণতিতে তাদের অপবিত্র জীবন ইতিহাস কুঞ্চিত হতে লাগল। এর মধ্যে আকর্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এ যে, আশুরার মর্মান্তিক ঘটনার পর যতগুলো বিদ্রোহ- বিল্পব উমাইয়্যা শাসকদের বি দ্ধে সংঘঠিত হয়েছে। তার শ্লোগান ছিল : 'মুহাম্মাদের বংশধরের সন্তুষ্টির জন্যে এবং হোসাইনের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে। এ শ্লোগান, এমনকি সৈরাচারী আব্বাসীদের শাসনকাল পর্যন্ত অব্যহত ছিল'। (দেখুন :আবু মুসা খোরাসানী যিনি বনী উমাইয়্যাদের শাসন- ক্ষমতার জড় কেটে দিয়েছিলেন, তিনি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে এ শ্লোগানটির সাহায্য নিয়েছেন (কামেল ইবনে আছীর ৫ম খঃ, পৃঃ নং ৩৭২,) তাওয়্যাবীনদের বিদ্রোহ্ ও বিল্পব সংঘটিত হয়েছিল এ শ্লোগানের মাধ্যমে : (কামেল ইবনে আছীর ৪র্থ খঃ, পৃঃ নং ১৭৫)।

জনাব মোখতার ইবনে আবি ওবায়দাহ্ ছাফাফীর বিল্পবেও এ শ্লোগানগুলোর সাহায্য নিয়েছিলেন। (কামেল ইবনে আছীর ৪র্থ খঃ, ২৮৮)।

বনী- আব্বাসীদের বি দ্ধে "জনাব হোসাইন ইবনে আলী ফাখ যে বিদ্রোহ্ করেছিলেন তাঁর আহ্বান ছিল :অর্থাৎ 'তোমাদেরকে নবী বংশের সন্তুষ্টী অর্জনের জন্যে আহবান জানাচ্ছি' (মাকাতেলুত- তালেবীন পৃঃ নং ২৯৯, তারিখে তাবারী ৮ম খঃ, পৃঃ নং ১৯৪)।

ইমাম হোসাইন (আঃ) এর রক্তে রঞ্জিত বিল্পব আজকেও আমাদের শীয়া' দের জন্যে এক মহান আদর্শ। যে কোন স্বৈরতন্ত্র উপনিবেসবাদ, নির্যাতন- নিপিড়ন ও জুলুম- অত্যাচারের বি দ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণের অনুপ্রেরনার উৎস সৃষ্টি করেছে আমাদের মধ্যে এ

শ্লোগানগুলো : ‘অপমান আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাক’ (আমরা অপমানের জীবন যাপন করতে চাই না)।

‘প্রকৃত জীবন হচ্ছে ঈমান ও জিহাদ’। যার সূচনা হয়েছে রক্তঝরা কারবালায়। আর সব সময় আমাদেরকে সাহায্য করে আসছে জালিম শাসকদের বি দ্ধে খে দাঁড়াতে এবং শহীদদের সরদার ইমাম হোসাইন ও তাঁর সাথীদের অনুসরণ করে জালিম শাসকদের অন্যায়- অবিচারকে উৎখাত করে দিতে। (ইসলামী বিল্পবের আন্দোলন চলাকালে ইরানের সবর্ত্র আমরা এ শ্লোগানগুলোকে প্রত্যক্ষ করেছি)।

সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে যে, ইসলামের মহান শহীদদের স্মৃতি বিশেষ করে কারবালার শহীদদের রক্তাক্ত স্মৃতি, ঈমান ও আকীদার পথে আত্মত্যাগ, সংগ্রাম, বীর সাহসীকতা ইত্যাদি সব সময় আমাদেরকে উজ্জীবিত করে রাখে এবং আমাদেরকে জালিমের সামনে মাথানত না করে উন্নত শিরে বেঁচে থাকার শিক্ষা দান করে। এ হচ্ছে শহীদদের স্মৃতি জীবিত করে ধরে রাখা এবং প্রতি বছর নতূন করে শোক- মাতমের অনুষ্ঠানাদি পালন করার দর্শন।

হয়তো বা কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা জানে না যে, আমরা শোক অনুষ্ঠানসমূহে কি করি এবং এ ঘটনাকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে এভাবে চিন্তা করবে যে, ভুলে যাওয়ার ধুলাবালি এর উপর পড়ে গেছে। কিন্তু আমরা নিজেরা জানি, এ স্মৃতিসমূহকে জীবিত করে ধরে রাখার কারণে কী প্রতিফল অতিতে পাওয়া গেছে, বর্তমানে কী সুফল দিচ্ছে ও আগামীতে কী সুফল বয়ে আনবে।

অহুদের যুদ্ধের পর সাইয়্যেদু শুহাদা হযরত হামযা (আঃ) এর উপর রাসূলে আকরাম (সাঃ) ও অন্যান্য মুসলমানদের শোক অনুষ্ঠান পালনের কথা সমস্ত প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে যে, রাসূলে আকরাম (সাঃ) এক আনছারের বাড়ীর কিনারা দিয়ে যাচ্ছিলেন, রোনাজারী ও শোকগাঁথার শব্দ শুনতে পেলেন, রাসূলের চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হল, তাঁর গন্ডদেশ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তিনি বললেন : কিন্তু আমার চাচা জনাব হামযাহর কোন শোকবহ ও শোকার্ত নেই। সা’দ ইবনে মায়ায রাসূলের এ কথাটি শনুলেন এবং বনী আব্দুল আশহালের একটি

গোত্রের নিকট গেলেন। সেখানকার নারীদেরকে বললেন : তোমরা রাসূলের চাচা হযরত হামযাহর বাড়ীতে যাও এবং সাইয়্যেদু শুহাদা হযরত হামযার জন্য শোক মাতম করো। (কামেল ইবনে আছীর, ২য় খঃ, পৃঃ নং ১৬৩। সীরায়ে ইবনে হিশাম, ৩য় খঃ, পৃঃ নং ১০৪)।

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, এই কাজ ও এই অনুষ্ঠান শুধুমাত্র হযরত হামযার জন্যে নির্দিষ্ট ছিল না বরং এটা ছিল একটা গৃহিত কর্মসূচী- যা সমস্ত শহীদদের ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে। আর তাঁদের শাহাদাতের স্মৃতিকে বতর্মান বংশধর ও ভবিষ্যৎ উ রসুরীদের জন্যে বজায় রাখতে হবে। এখন আমি ১৪১৭ হিজরী সালের মুহররামের দশ তারিখ বা আশুরার দিনের পরিস্থিতি সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লিখছি; সত্যি সত্যি সমগ্র শিয়া জগতে এক বিরাট আবেগ উে জনা ছেয়ে আছে। বালক- কিশোর, নব যুবক, যুবক, পৌড়- বৃদ্ধ সর্বস্তরের লোকেরা সকলেই কালো পোষাক পরিধান করে আছে, সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে ইমাম হোসাইন ও কারবালার অন্যান্য শহীদদের শোকপালন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছে। তাদের জীবন- যিন্দেগী ও চিন্তা- ভাবনার মধ্যে এমন এক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, এ মূহুর্তে যদি তাদেরকে ইসলামের দুশমনদের বি দ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানানো হয় তাহলে সাথে সাথেই অস্ত্র হাতে নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। যে কোন প্রকারের ত্যাগ ও কোরবানী দিতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা করবেনা। মনে হয় যেন শাহাদতের রক্ত তাদের ধমনীতে ছুটাছুটি করছে। মনে হচ্ছে এ সময়ই ও এ মূহুর্তেই তাঁরা ইমাম হোসাইন ও তাঁর সাথীগণকে কারবালার ময়দানে ইসলামের পথে নিজেদেরকে উৎসর্গ করার জন্যে তাদেরই সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

বীর গাথা যে সমস্ত কবিতা এ মহান অনুষ্ঠানে পাঠ করা হচ্ছে তা বিশ্ব সৌর শক্তি ও উপনিবেসবাদীদের উপর মারাত্মক আঘাত হানছে এবং জুলুম- নির্যাতনের সামনে আত্মসমর্পন না করার জন্যে আত্মবল সৃষ্টি করছে। আর অপমানের জীবনের চাইতে গর্ব ও বীরে র মৃত্যু অতি উ ম বলে উৎসাহিত করছে।

আমরা বিশ্বাস করি : এ শোকানুষ্ঠানসমূহ একটা বিরাট আধ্যাত্মিক পুঁজি, যার হেফাজত করা দরকার এবং ইসলাম, ঈমান ও তাকওয়াকে জিইয়ে রাখার জন্যে এটা অত্যন্ত জ রী।

৭৩. অস্থায়ী বিবাহ্ :

আমরা বিশ্বাস করি : অস্থায়ী বা সাময়িক বিবাহ্ একটি শারীয়াত সম্মত বিষয়; যা ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে "মুতআহ্" নামে প্রসিদ্ধ। এ হিসাবে বিবাহ্ দু' প্রকারের : এক প্রকারের বিয়ে হচ্ছে স্থায়ী যার সময়সীমা নির্দিষ্ট নয়। দ্বিতীয় প্রকারের বিয়ে হচ্ছে সাময়িক বা অস্থায়ী যার সময় সীমা দু' পক্ষের ঐক্যমত্যের ভি তে নির্ধারিত হয়।

এ অস্থায়ী বিবাহ্ অনেক ক্ষেত্রেই স্থায়ী বিয়ের অনুরূপ, যেমন : মোহরানার বিষয়, স্ত্রী সব ধরণের বাধামুক্ত হতে হবে। এ বিয়ের মাধ্যমে যে সমস্ত সন্তানাদি জন্ম নিবে তাদের হুকুম-আহকামে স্থায়ী বিয়ের সন্তানাদিদের সাথে কোন তফাৎ নেই, সম্পর্ক ছিন্নের পর ইদ্দত সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদের দৃষ্টিতে এ সব বিষয়গুলো স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। অন্য কথায় অস্থায়ী বা মুতআহ্ এক প্রকারের বিয়ে বন্ধন যার মধ্যে বিয়ের সমস্ত বৈশিষ্ট্যাবলী বিদ্যমান।

অবশ্য স্থায়ী বিয়ে ও সাময়িক বিয়ের মাঝে কিছু তফাৎও রয়েছে। যেমন অস্থায়ী বিয়েতে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়ি স্বামীর জন্যে ফরজ নয়। স্বামী-স্ত্রী কেউ করো সম্পদের ওয়ারিছ হবে না। কিন্তু তাদের সন্তানরা পিতা-মাতা উভয়ের সম্পদের উওরাধিকারী হবে এবং ভাই-বোন পরস্পরের সম্পদের ওয়ারিছ হবে। যা হোক, আমরা মুতআহ্ বিয়ের বিধানকে আল-কোরআন থেকে গ্রহণ করেছি। কোরআনে আল্লাহ্ বলেন :

'অতঃপর যে স্ত্রীর সাথে মুতাহ্ করেছো তাদেরকে তাদের ধার্যকৃত মোহরানা প্রদান করো' (সূরা : আন-নিসা আয়াত নং ২৪)।

বড় বড় মোফাস্সিরে কোরআন ও মোহাদ্দিসগণ অনেকেই ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, কোরআনের এ আয়াত মুতাহ্ তথা অস্থায়ী বিয়ে সম্পর্কিত।

তাফসীরে তাবারীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বহু সংখ্যক হাদীস উল্লেখ করেছেন। যা প্রমাণ করছে যে, এ আয়াত অস্থায়ী বা সাময়িক বিয়ে সম্পর্কিত এবং রাসূলের বিরাট সংখ্যক একদল সাহাবী এ পর্যায়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন (তাফসীরে তাবাররী ৫ম খঃ পৃঃ নং ৯)।

তাফসীরে দুররে মানছুর ও সুনানে বায়হাকীতেও এ পর্যায়ে প্রচুর হাদীস উল্লেখ করেছেন। (আদদুরারিল মানছুর ২য় খঃ, ১৪০), (সুনানে বায়হাকী ৭ম খঃ পৃঃ নং ২০৬)। ছহীহ্ রোখারী, ছহীহ্ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল আরো অনেক গ্রন্থাবলীতেও রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর যামানায় অস্থায়ী বিয়ের প্রচলন ছিল বলে প্রচুর হাদীস বর্ণিত রয়েছে। যদিও এর বিরোধী হাদীসও উল্লেখ রয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল ৪র্থ খঃ পৃঃ নং ৪৩৬, ছহীহ্ বোখারী শরীফ ৭ম খঃ, পৃঃ নং ১৬, ছহীহ্ মুসলিম শরীফ ২য় খঃ, পৃঃ নং ১০২২, শিরোনাম : বাবে নিকাহিল মুতআহ্ দেখুন)। আহলে সুন্নতের একদল ফকীহ্ বিশ্বাস করেন যে, মুতআহ্ বিবাহ্ রাসূলের যামানায় প্রচালিত ছিল। পরবর্তীতে এ বিধান রহিত করা হয়েছে। অথচ আরেক দল ফকীহ্ বলেন : এ বিধান রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর জীবনের শেষ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। পরবর্তীতে দ্বিতীয় খলিফা জনাব ওমর এ বিধান বাতিল করেছেন। জনাব ওমর নিজে বলেন :

'রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর যামানায় দু' প্রকারের মুতআহ্ বিয়ের প্রচলন ছিল। শুধুমাত্র এ দু'টোকে আমি হারাম ঘোষণা করেছি এবং এর উপর শাস্তির বিধান করেছি। একটি হলো "মুতআতুন্নিসা" (সাধারণ প্রচলিত লোকের সাথে মুতআহ্)। দ্বিতীয়টি হলো "মুতআতুল হাজ্ব" (বিশেষ এক ধরনের হজ্জ)'।

এ হাদীসটি ঠিক একই পরিভাষায় অথবা বিষয়বস্তুর দিক থেকে অনুরূপ অন্য ভাষায় সুনানে বায়হাকীতে রয়েছে (৭ম খঃ ২০৬পৃঃ)। এ ছাড়া আরো বহু গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। আল- গাদীরের রচয়িতা ২৫টি হাদীস, ছীহাহ্ হাদীসগ্রন্থ ও মুসনাদ গ্রন্থাবলী থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করে লিখেছেন : মুতআহ্ বিয়ে ইসলামী শারীয়াতে রাসূলের যামানায়, প্রথম খলিফার যামানায় ও খলিফা ওমরের সময়ের একটা অংশ পর্যন্ত হালাল, সাধারণ রীতিসিদ্ধ ও প্রচলিত ছিল। অতঃপর জনাব ওমর নিজের জীবনের শেষের দিকে এসে এ বিধানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন (দেখুন আল- গাদীর ৩য় খঃ, পৃঃ নং ৩৩২)।

কোনই সন্দেহ নেই যে, ইসলামের এ বিধানটির ব্যাপারে আহলে সুন্নতের হাদীস ও বর্ণনাসমূহে অন্যান্য আরো অনেক বিষয়ের ন্যায় দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা রয়েছে। তাদের কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে, রাসূলের যামানাতেই তা রহিত হয়ে গেছে। আরেক দলের বিশ্বাস হচ্ছে দ্বিতীয় খলিফার যামানায় এসে নিষিদ্ধ হয়েছে। একদল তা সম্পূর্ণই অস্বীকার করছে। তাদের ফীকাহগত মাসয়ালা- মাসায়েলের ক্ষেত্রে এ জাতীয় বহু বিরোধ বর্তমান রয়েছে। কিন্তু আমাদের শিয়া ফকীহগণ মুতআহ্ একটি শারীয়াত সিদ্ধ বিধান বলে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। তাঁরা বলেন : রাসূলের যামানায় এ বিধান বাতিল হয়নি। আর রসূলের পর বাতিল হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। (কেননা রাসূলের পরে ইসলামী শারীয়াতে কোন কিছু কমানো বাড়ানোর অধিকার ও ক্ষমতা কাউকেই দেয়া হয়নি।)

যাহোক, আমরা বিশ্বাস করি : অস্থায়ী বিয়ে যদি অন্যায় সুযোগ- সুবিধা গ্রহণের অবস্থা সৃষ্টি না করে তাহলে আমাদের সমাজের সে সমস্ত যুবকদের প্রয়োজনের একটা অংশ মিটাতে সক্ষম যারা স্থায়ী বিয়ে করতে অক্ষম। অথবা যে সমস্ত মুসাফির লোকেদের ব্যবসা- বানিজ্য ও অর্থ উপার্জনের জন্যে অথবা শিক্ষাজর্নের প্রয়োজনে কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনের তাগিদে একটা দীর্ঘ সময়-কাল নিজেদের পরিবার থেকে দূরে অবস্থান করতে হয়। এ ছাড়া আরো বহু কারণে অস্থায়ী বিয়ের প্রচলন, সমাজে থাকা দরকার। যেমন : অস্থায়ী বিয়ের সুযোগ না থাকলে ঐ সমস্ত লোকদের মাঝে অশ্লীল কর্ম ছড়িয়ে পড়ার দরজা খুলে যাবে। বিশেষতঃ আজকের আমাদের এ যুগে যেভাবে বিভিন্ন কারণে যুব সমাজের স্থায়ী বিয়ের বয়স সীমা বেড়ে গেছে অপর দিকে কামভাব ও উে জনা শক্তিকে আন্দোলিত করার জন্যে প্রচুর ব্যবস্থা অহরহ আশে পাশে রয়েছে; সেখানে যদি সাময়িক বিয়ের এ সুন্দর বিধান বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে সমাজ ধবংশকারীর জন্য অশ্লীল ও অবৈধ কর্মকান্ডের পথ নিঃসন্দেহে প্রশস্ত হয়ে যাবে।

আবারও বলছি : আমরা ইসলামের এ বিধান দ্বারা যে কোন প্রকারের অন্যায় সুযোগ সুবিধা গ্রহণ, এটাকে কামুকদের হাতের খেলনা বানানো ও নারীদেরকে কলুষতার দিকে টেনে আনার

কঠোর বিরোধী। কিন্তু কোন কোন কামুকদের অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করার কারণে মূল আইনের বি দ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়ানো উচিৎ হবে না বরং অন্যায় সুযোগ গ্রহণের পথ রোধ করতে হবে।

৭৪. শিয়া মাযহাবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

আমরা বিশ্বাস করি : শিয়া মাযহাবের জন্ম লগ্ন রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর জীবদ্দশায়ই এবং এ পর্যায়ে তাঁর বক্তব্যও রয়েছে। এর স্পষ্ট দলীল- প্রমাণও আমাদের হাতে রয়েছে।

বহু সংখ্যক মোফাস্সিরে কোরআন এ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে লিখেছেন : 'নিঃসন্দেহে যেসব লোকেরা ঈমান এনেছে ও সৎ কর্ম আঞ্জাম দিয়েছে তাঁরা (আল্লাহর) সৃষ্টির মধ্যে উ ম সৃষ্টি' (সূরা : বাইয়্যেনাহ, আয়াত নং৭)।

রাসূল (সাঃ) বলেন : এ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে আলী ও তাঁর শিয়ারা। আল্লামা সুয়ূতী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ "আদ্দুর ল মানসূরে" বর্ণনা করেছেন। জনাব ইবনে আসাকির জনাব জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় আলী (আঃ) আমাদের দিকে আসলেন রাসূল (সাঃ) তাঁকে দেখে বললেন :

'সেই মহান স ার শপথ! যাঁর হাতের মুঠোয় রয়েছে আমার জীবন! এই (আলী) ও তাঁর শিয়ারা কিয়ামতের দিন সফলকাম'।

অতঃপর এ আয়াত إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ অবতীর্ণ হলো। এরপর থেকে যখনই আলী (আঃ) রাসূলের সাহাবাদের বৈঠকে উপস্থিত হতেন তাঁরা বলতেন :অর্থাৎ 'খোদার সৃষ্টির মধ্যে উ ম সৃষ্টি আগমন করেছেন' (আদ্দুররিল মানছুর ৬ষ্ঠ খঃ, পৃঃ নং ৩৭৯)।

অনুরূপ অর্থে জনাব ইবনে আব্বাস, আবু বারাযাহ্, ইবনে মাদুবিয়্যাহ্ ও আতিয়া উরফী (সামান্য পার্থক্য সহ) বর্ণনা করেছেন, (পয়ামে কোরআন, ৯ম খঃ ২৫৯ পৃষ্ঠার পর)।

এভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, "শিয়া" নামটি সে সমস্ত লোকদের জন্যে স্বয়ং রাসূল (সাঃ) চয়ন করেছেন যাঁরা হযরত আলী (আঃ) এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁদের নামটি স্বয়ং আল্লাহর রাসূল দিয়েছেন। খলীফাদের সময়কালেও নয় আর ছাফাবিয়্যাদের আমলেও নয়। যদিও আমরা অন্যান্য ইসলামী ফেরকাসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করি, তাদের সাথে এক কাতারে দাঁড়িয়ে জামায়াতের সাথে নামায পড়ি, একই সময়ে ও একই স্থানে হজ্বব্রত পালন

করি ও ইসলামের অভিন্ন স্বার্থে সহযোগিতা করি; তারপরও বিশ্বাস করি যে, যেহেতু হযরত আলীর অনুসারীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং রাসূল (সাঃ) এর বিশেষ দৃষ্টি ও আনুকূল্য রয়েছে। এ কারণেই আমরা এ মতের অনুসরণকে বেছে নিয়েছি।

শিয়া বিরোধী একদল লোক অতি জোর দিয়ে বলে যে, এ মাযহাবের সাথে আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবার একটা যোগ সূত্র রয়েছে এবং শিয়ারা তার অনুসারী। সে ছিল আসলে একজন ইয়াহুদী ও পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে। এটা একটা আশ্চর্য জনক কথা ব্যাতীত কিছু নয়। কেননা, শিয়া মাযহাবের সমস্তবই- পুস্তক, কিতাব- পত্র অনুসন্ধান করে দেখা যাচ্ছে যে, এ মাযহাবের কারো সাথে ঐ লোকটির বিন্দু মাত্র সম্পর্ক ছিল না। বরং শিয়া মাযহাবের সমস্ত ইলমে রিজালের কিতাবসমূহ আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবাহকে একজন পথভ্রষ্ট- গোমরাহ্ হিসাবে পরিচয় করিয়েছে। আমাদের কোন কোন বর্ণনা মোতাবেক দেখা যায় : মোরতাদ হওয়ার কারণে আলী (আঃ) তাকে হত্যা করার নির্দেশ জারি করেছিলেন। (দেখুন : তানকীহুল মাকাল ফী ইলমির রিজাল, আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবা শিরোনাম)।

এ ছাড়াও ইতিহাসে আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবা নামে কোন লোকের অস্তি ছিল কি- না, তাই প্রশ্নবোধক! কোন কোন গবেষকদের বিশ্বাস হচ্ছে, আসলে সে একটা রূপকথা ও কল্পকাহিনী। তার অস্তি বলতে কিছু নেই। কিভাবে সম্ভব সে শিয়া মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হবে? (দেখুন : আল্লামা আসকারী রচিত- আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবা)।

যদিও ধরে নেই সে একজন কল্পকাহিনীর লোক নয়; কিন্তু আমরা তো তাকে পথভ্রষ্ঠ- গোমরাহ্ বলে জানি।

৭৫. শিয়া মাযহাবের ভৌগলিক অবস্থান :

এ কথাটি গু ে র দাবী রাখে যে, সব সময় শিয়াদের কেন্দ্রস্থল ইরান ছিল না। বরং ইসলামের প্রথম যুগে বিভিন্ন স্থানে শিয়াদের কেন্দ্র ছিল। যেমন : কুফা, ইয়ামান, মদীনা ও সিরিয়ায়।

উমাইয়্যাদের বিষাক্ত অপপ্রচার সে ও শিয়াদের বেশ কয়টি কেন্দ্র ছিল। যদিও ইরাকে তেমন প্রসার লাভ করতে পারেনি।

মিশরেও সবসময় শিয়াদের অনেক লোকজন বসবাস করত। এমনকি মিশরে ফাতেমী খলীফাদের আমলে রাষ্ট্র ক্ষমতা শিয়াদের হাতে ছিল। (সিরিয়ায় শিয়ারা যেমন উমাইয়্যাদের শাসনকালে এক ভয়ানক ও আতংকজনক চাপের মুখে ছিলেন তেমনি আব্বাসীয়দের আমলেও নিরাপ াহীনতায় ভুগছিলেন। সে সময় তাঁদের অনেককেই উমাইয়্যাহ্ ও আব্বাসীদের কারাগারে জীবন দিতে হয়েছে। তখন একদল লোক পূর্ব দিকে চলে যাবার পথ বেছে নিল। আরেকদল পশ্চিমদিকে পাড়ি দিল। তাঁদের থেকে জনাব ইদ্রিস ইবনে আব্দুল্লাহ্ বিন হাসান মিশরে চলে গেলেন। সেখান থেকে মারাকেশ (মাগরিব) এবং সেখানকার শিয়াদের সহযোগীতায় ইদ্রীসিয়ান নামে একটি সরকার গঠন করলেন, যা দ্বিতীয় হিজরীর শেষ হতে শু হয়ে ৪র্থ হিজরীর শেষ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এ দিকে মিশরের শিয়ারা আরেকটি সরকার গঠন করলেন। এরা নিজেদেরকে ইমাম হোসাইনের বংশধর এবং রাসূল কন্যা হযরত ফাতিমা যাহরার আওলাদ বলে জানত। তারা যখন দেখতে পেল যে, মিশরের অধিবাসীরা শিয়াদের সরকার গঠনের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রস্তুত তখন তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করল এবং ৪র্থ হিজরী শতাব্দীতে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠন করে। কাহেরা শহরকে রাজধানী হিসাবে নির্দিষ্ট করল। ফাতিমী খলীফারা সর্বমোট চৌদ্দজন ছিলেন- যাদের দশজন সরকারের কেন্দ্রস্থল ছিল মিশরে এবং প্রায় তিনশ বছর মিশর ও সমগ্র আ ীকাতে হুকুমত চালায়। আল আযহার জামে মসজিদ ও জামেয়া আল আযহার (আল আযহার বিশ্ব বিদ্যালয়) এরাই প্রতিষ্ঠা করে। ফাতেমীয়ান নামটি হযরত ফাতেমা যাহরা (সালাঃ) থেকে চয়ন করেছে। দায়েরাতুল মাআ' রেফ গ্রন্থকার জনাব দেহেখোদা, ফরীদ ভিজরী রচিত দায়েরাতুল মাআরেফ, ওয়ালমুনজিদ ফিল এলাম, ফুতুম ও যুহর পরিভাষা)।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিয়া মুসলমানরা বসবাস করছে। যেমন : সউদী আরবের পূর্বাঞ্চলে বহু সংখ্যক শিয়া জীবন- যাপন করছে এবং অন্যান্য ফেরকার লোকদের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। যদিও ইসলামের দুশমনরা সব সময় এ চেষ্টায় লিপ্ত ছিল ও আছে যে,

মুসলমানদের শিয়া ও অশিয়াদের মাঝে শত্রুতা, ভুল বুঝাবুঝি, সন্দেহ, অবিশ্বাস, নিরাশা, মতবিরোধ ও ঝগড়া- লড়াই ইত্যাদি সৃষ্টি করবে এবং উভয় পক্ষকে দুর্বল করবে।

বিশেষ করে আজকের এ যুগে ইসলাম যখন এক বিরাট বিশ্ব শক্তির রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মোকাবিলায় জোরালো ভূমিকা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, আর বিশ্ব মানবতাকে বস্তুবাদের হতাশা ও নিরাশার কবল থেকে মুক্তির জন্যে নিজের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। তখন মুসলমানদের এ শক্তিকে বিচূর্ণ করার ও ইসলামের অগ্রগতিকে খে দাঁড়াবার জন্যে ইসলামের দুশমনদের সবচেয়ে বড় আশার আলো হচ্ছে যে, মুসলমানদের মধ্যে মাযহাবগত মতবিরোধের আগুনকে প্রজ্বলিত করা । কিন্তু যদি মুসলমানদের সব মাযহাবের অনুসারীরা জেগে ওঠে ও সাবধান হয় তাহলে এ বিপদজনক ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিতে পারে।

কথিত আছে যে, সুন্নীদের মত শিয়াদের মধ্যেও অনেক ফেরকা আছে। কিন্তু সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হচ্ছে শিয়া "ইছনা আশারী" (বার ইমামে বিশ্বাসী শিয়া) যারা শিয়া জগতের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক দ্বারা সংগঠিত।

যদিও শিয়া মুসলমানদের সংখ্যা অন্যান্য মুসলমানদের তুলনায় যথাযথভাবে স্পষ্ট নয়, কিন্তু কোন কোন পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, প্রায় বিশ থেকে ত্রিশ কোটি শিয়া বিশ্বে আছে- যা সমগ্র মুসলিম জাতির প্রায় এক চতুর্থাংশ।

৭৬. আহলে বাইত (আঃ) এর মিরাছ :

আমাদের এ মাযহাবের অনুসারীরা বহু সংখ্যক হাদীস আহলে বাইতের ইমামগণের মাধ্যমে রাসূলে আকরাম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং আরও বহু হাদীস হযরত আলী (আঃ) ও অন্যান্য ইমামগণের কাছ থেকে পেয়েছেন- যা শিয়াদের ান- বি ান ও শিক্ষা- দীক্ষা এবং তাদের ফীকাহ্ শাস্ত্রের মূল উৎস হিসাবে পরিগণিত এবং নিম্নে বর্ণিত চারটি হাদীস গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থসমূহ "কুতুবে আরবায়াহ্" নামে খ্যাত : "কাফী", "মান লা ইয়াহযু ল ফাকীহ্", "তাহযীব", ও ইসতিবছার। কিন্তু একটি বিষয় পুনরাবৃি করা জ রী মনে করছি- সেটা হল এই

যে, যে কোন হাদীস এ চারটি বিখ্যাত গ্রন্থে অথবা নির্ভরযোগ্য অন্য যে কোন গ্রন্থে বর্তমান থাকুক না কেন তার অর্থ এই নয় যে, সে হাদীসটি বিশেষভাবে নির্ভরযোগ্য। বরং প্রত্যেকটি হাদীসই সনদের ক্রমধারা বিশিষ্ট- যা প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে রেজাল গ্রন্থের সনদের ভি তে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। যখন তার সমস্ত রেজাল সনদ নির্ভরযোগ্য বলে প্রতিয়মান হবে তখন তা একটি ছহীহ্ হাদীস বলে গৃহিত হবে। তা না হলে, সেটি সন্দেহজনক বা দূর্বল হিসাবে পরিগণিত হবে। আর এ সন্ধান কাজ কেবলমাত্র হাদীস শাস্ত্রবিদ ও রিজাল শাস্ত্রবিদ ওলামারাই করতে পারেন।

এখান থেকে একটি বিষয় পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে, শিয়াদের হাদীস সংগ্রহের পদ্ধতি আহলে সুন্নাতের বিখ্যাত উৎসগুলোর পদ্ধতি থেকে পৃথক। এ কারণে যে, সুন্নীদের ছিহাহ্ গ্রন্থগুলো বিশেষতঃ ছহীহ্ বোখারী ও মুসলিমের লেখকদের ভি ছিল এই যে, তাঁরা যে সমস্ত হাদীস সংগ্রহ করেছেন সেটাই তাঁদের নিকট ছহীহ্ (বিশুদ্ধ) ও নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছেন। এ দলীলের ভি তে তারা তাদের সে হাদীস গ্রন্থগুলোর যে কোন হাদীসকে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের দলীল হিসাবে উপস্থাপন করতে পারে, (ছহীহ্ মুসলিমের ভূমিকা ও ফতহুল বারী ফী ছহীহুল বোখারী দেখুন)।

পক্ষান্তরে শিয়াদের হাদীস সংগ্রহের ভি হচ্ছে যে, তারা রাসূলের আহলে বাইতের ইমামগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত হাদীসসমূহকে সংগ্রহ করেছেন এবং তারা ছহীহ্ কি ছহীহ্ নয় তা জানার জন্যে ইলমে রিজালের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

৭৭. দুটি বড় গ্র :

শিয়াদের উৎসগুলোর মধ্যে অন্যতম গু পূর্ণ একটি উৎস যা শিয়াদের উ রাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত "নাহজুল বালাগাহ্"; যা মরহুম শরীফ রাযী (রাঃ) প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে হযরত আলী (আঃ) এর বক্তৃতা, চিঠি পত্র, ব্যাপক অর্থবহ স্মরণীয় বাণীসমূহ একত্রিত করে সাজিয়েছেন। এর অন্তর্নিহিত বিষয়সমূহ এতই উচ্চতর ও এর শব্দাবলী এতোই সৌন্দর্য ও শোভামন্ডিত যে,

কোন ব্যক্তি যে কোন মাযহাব ও যে কোন মতবাদেরই অনুসারী হোক না কেন, যদি এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে তাহলে তার উচ্চতর বিষয়বস্তুর প্রভাবে প্রভাবা িত হয়ে পড়বে। হায়! যদি শুধুমাত্র মুসলমানরাই নয় অমুসলমানরাও এ গ্রন্থের উচ্চ মানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হত তাহলে ইসলামের উচ্চতর ান- বি ান, মূলনীতি, এক বাদ, পরকাল, রাজনৈতিক, সামাজিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে বুঝতে পারত।

আমাদের দ্বিতীয় বড় একটি গ্রন্থ হচ্ছে : "ছহীফায়ে সাজ্জাদিয়্যাহ্"- যা অত্যন্ত সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় অতীব, উ ম কতিপয় দোয়ার সমষ্টি। অত্যন্ত উন্নত মানের, উচ্চতর ও গভীর তাৎপর্যমন্ডিত বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ একটি দোয়ার গ্রন্থ।বস্তুতঃ এ গ্রন্থ "নাহজুল বালাগার" বক্তব্যকেই অন্য রকম রীতি- পদ্ধতিতে তুলে ধরেছে। এর প্রতিটি বাক্য নতুন নতুন শিক্ষা দান করে। মানুষের আত্মায় সঞ্চারিত করে পবিত্রতা ও নূরানী পরিবেশ।

এ দোয়ার গ্রন্থটি এমন যে, নাম থেকেই জানা যাচ্ছে এ হচ্ছে শিয়াদের ৪র্থ ইমাম হযরত আলী ইবনুল হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবী তালীব (যয়নুল আবেদীন) (আঃ) এর দোয়ার সমষ্টি- যার একটি বিখ্যাত লাকাব হচ্ছে "সাজ্জাদ"। এ কারণেই এর নামকরণ করা হয়েছে "ছহীফায়ে সাজ্জাদিয়্যাহ্"। আমরা যখন চাই যে, দোয়া ও প্রার্থনার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাথে আমাদের একটা আত্মিক যোগসূত্র স্থাপন করব এবং মহান প্রভূর প্রতি আমাদের অন্তরে এক ভালবাসার ঢেউ- তরঙ্গ সৃষ্টি করব তখন এ দোয়ার কিতাবটি নিয়ে বসে যাই। আর ত - তাজা উদ্ভিদ যেমন বসন্তের বরকতপূর্ণ বৃষ্টির পানি আহরণ করে পরিতৃপ্ত হয়, তেমনি আমরাও এ দোয়া- প্রার্থনার মাধ্যমে আত্মার তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করি।

শিয়াদের সর্বাধিক হাদীস, প্রায় দশ হাজার হাদীস পঞ্চম ও ষষ্ঠ ইমাম অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলী আল বাকের ও ইমাম জা' ফর ইবনে মুহাম্মদ আস সাদিক (আঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য উল্লেখযোগ্য একটা অংশ অষ্টম ইমাম হযরত আলী ইবনে মুসা আর রেযা (আঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আর এটা এ কারণে সম্ভব হয়েছে যে, এ তিনজন মহান ইমাম স্থান- কালভেদে এমন পরিস্থিতি ও পরিবেশে অবস্থান করেছিলেন যে, বনী উমাইয়্যাহ্ ও বনী

আব্বাসী শাসকগোষ্ঠির (রাজনৈতিক সংকটের কারণে) চাপের পরিমাণ তুলনামূলক কম ছিল। এ কারণে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন অধিক সংখ্যক হাদীস- যা তাঁদের পিতা ও পিতামহগণের মাধ্যমে রাসূলে আকরাম (সাঃ) থেকে তাঁদের কাছে পৌঁছে ছিল, তা ইসলামের ান- বি ানে সমস্ত অধ্যায়ে ও ফেকাহ্ শাস্ত্রের হুকুম- আহকামের পর্যায়ে স্মারকলিপির আকারে রেখে গেছেন। এ কারণেই শিয়া মাযহাবকে জা' ফরী মাযহাব বলা হয়। এর কারণেই যে, সর্বাধিক হাদীস ষষ্ঠ ইমাম হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ আস সাদিক (আঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি এমন এক যুগে বসবাস করতেন, যখন উমাইয়্যারা রাজনৈতিকভাবে খুবই দূর্বল অবস্থায় ছিল। এর পর আব্বাসীরা এসে চাপ সৃষ্টি করার মত পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চায় করতে পারেনি। আমাদের গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে যে, তিনি চার হাজার শিষ্য- শাগরিদকে হাদীস শাস্ত্রে, ইসলামের বিভিন্ন ান- বি ানে ও ফীকাহ্ শাস্ত্রে শিক্ষা- প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করে গড়ে তুলেছেন। হানাফী মাযহাবের নেতা ইমাম আবু হানীফা একটি ছোট্ট কথায় ইমাম জা' ফর ইবনে মুহাম্মদ আস সাদিক (আঃ) এর ব্যাপারে এভাবে প্রসাংশা করে বলেছেন :

'আমি ইমাম জা' ফর ইবনে মুহাম্মদ (আঃ) থেকে বড় ফকীহ্ আর কাউকে দেখিনি, (আল্লামা যাহবী রচিত "তাযকেরাতুল হুফফায", খঃ- ১ম, পৃঃ- ১৬৬)।

মালেকী মাযহাবের বড় নেতা জনাব ইমাম মালেক ইবনে আনাস তাঁর বক্তব্যে এভাবে বলেছেন : আমি একটা দীর্ঘকাল যাবৎ ইমাম জা' ফর ইবনে মুহাম্মদ (আঃ) এর নিকট আসা- যাওয়া করতাম । তাঁকে সর্বদা এ তিন অবস্থার যে কোন একটি অবস্থায় দেখতে পেতাম : হয় তিনি নামাজরত অবস্থায় থাকতেন কিংবা রোজা রাখার কৃচ্ছতা সাধনরত থাকতেন অথবা কোরআন পাঠে লিপ্ত থাকতেন। আমার বিশ্বাস মতে ান- গরীমা ও ইবাদত- বন্দেগীর দিক থেকে ইমাম জা' ফর ইবনে মুহাম্মদ আস সাদিক (আঃ) থেকে মর্যাদাবান ব্যক্তি আর কাউকে দেখেনি, (তাহ্যীবুওাহ্যীব, ২য় খঃ, পৃঃ নং ১০৪। উদ্ধৃত গ্রন্থ : আসাদ হায়দার রচিত- আল- ইমামু ছাদিক ১ম খঃপৃঃ, নং ৫৩)।

যেহেতু এখানে আমাদের আলোচনা নিতান্ত সার- সংক্ষেপ ভি ক, তাই আহলে বাইতের ইমামগণের সম্পর্কে অন্য সব বড় বড় বি ওলামাদের বক্তব্য লিখলাম না।

৭৮বি ানে শিয়াদের ভূমিকা -ইসলামী ান . :

আমরা বিশ্বাস করি : ইসলামী ান- বি ানের সূচনা লগ্ন থেকেই শিয়াদের প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকা ছিল। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, ইসলামী ান- বি ান তাঁদের থেকেই উৎসারিত ও দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এমনকি এ ব্যাপারে বই- পুস্তকও রচিত হয়েছে- যাতে এ বিষয়ের দলীল প্রমাণও উপস্থাপন করেছে। কিন্তু আমরা বলব অন্ততঃপক্ষে এ ান- বি ান উৎসারণ পর্যায়ে তাঁদের ভূমিকা ছিল যথোপযুক্ত। এর সবচেয়ে উওম দলীল প্রমাণ হচ্ছে ইসলামের ান- বি ান ও বিভিন্ন কলা- কৌশলের উপর শিয়া ওলামাদের অনেক গ্রন্থাবলীর সমাহর পরিলক্ষিত হয়। ইলমে ফীকহ্ ও ইলমে উছুলের জগতে হাজার হাজার কিতাব রচনা করেছেন - যার কোন কোনটি ব্যাপক বিস্তৃত ও নিজ বিষয়ে অতুলনীয়। তাফসীর ও উলূমে কোরআনের জগতেও হাজার হাজার কিতাব রচিত হয়েছে। হাজার হাজার বই- পুস্তক আকীদা- বিশ্বাস ও ইলমে কালামের উপর লিখা হয়েছে। অন্যান্য বিষয়েও হাজার হাজার গ্রন্থ শিয়া ওলামাগণ রচনা করেছেন। এ সব গ্রন্থ ও কিতাবসমূহের অনেকগুলো এখনও আমাদের পাঠাগারে ও দুনিয়ার বিখ্যাত বিখ্যাত গ্রন্থাগারে বর্তমান রয়েছে এবং সাধারণ লোকদের দর্শণের জন্যে রাখা হয়েছে। যে কোন লোক এ দাবীর সত্যতা যাচাই করার জন্যে এসব গ্রন্থাগারগুলোতে দেখতে পারেন।

একজন বি শিয়া ব্যক্তি এ সব কিতাবসমূহকে তালিকাবদ্ধ করেছেন এবং বিরাট বিরাট ২৬টি খন্ডে এ তালিকা গুলো বাঁধাই করেছেন।

এ খন্ড বা গ্রন্থ রাযীর নাম রাখা হয়েছে "আযযারীআতু ইলা তাছানী ফিশ শিয়াতে", সংকলনে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও মোফাসসির শেখ আগা বুযুর্গ তেহরানী। তালিকাভুক্ত এ সব গ্রন্থগুলোর সংখ্যা, লেখকের নাম ঠিকানাসহ মোট ৬৮ হাজারে দাঁড়িয়েছে। তালিকা সমৃদ্ধ এ মোজাল্লাদসমূহ ছাপানোর ও প্রকাশনার পর বেশ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। এ তালিকা প্রণীত

হয়েছে কয়েকদশক পূর্বে। শেষের দিকে কয়েক দশক ধরে একদিকে অতীত শিয়া ওলামাদের ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থসমূহকে পুন জ্জীবিত করার এবং পান্ডুলিপিসমূহের উদঘাটন পর্যায়ে প্রচেষ্টা চলছে। অপরদিকে নতুন নতুন রচনা ও সংকলনসমূহ সংগ্রহ করার কাজে লিপ্ত ছিল; যেসব গ্রন্থগুলোর সঠিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এখনও সম্ভব হয়নি। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ যে, ইসলামী ান- বি ানের প্রত্যেক বিষয়েই শত শত ও হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

৭৯. সত্য- সত্যবাদীতা ও আমানতদারী, ইসলামের অতি ত্বপূর্ণ বিষয় :

আমরা বিশ্বাস করি : সত্য- সত্যবাদীতা ও আমানতদারী ইসলামের অতি গু পূর্ণ ও ভি গত একটি রো বা স্তম্ভ। আল্লাহ্ বলেন :

'আল্লাহ্ বলবেন! আজ সেদিন- যেদিন সত্যবাদীদের সত্যবাদীতা তাদের কল্যাণে আসবে' (সূরা : আল মায়েদাহ্ আয়াত নং ১১৯)।

বরং কোন কোন আয়াত থেকে জানা যায় যে, কিয়ামতের দিন প্রকৃত প্রতিদান এমন প্রতিদান- যা সত্যবাদিতার ভি তে প্রদান করা হবে। (সে সত্যবাদিতা ঈমানের ক্ষেত্রে, খোদার সাথে প্রতিশ্রুতি, আমলের পর্যায়ে ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে)। আল্লাহ্ বলেন :

'এ জন্যে যে, আল্লাহ্ সত্যপরায়ণদেরকে তাদের সত্যবাদিতার প্রতিদান দেবেন'(সূরা : আল আহযাব, আয়াত নং ২৪)।

আগেও যেমন ইংগিত করেছি যে, কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা মুসলমাদের হিসেবে আমাদের দায়ি - কর্তব্য হচ্ছে যে, আমরা আমাদের জীবনটাকে মা'সুম ও সত্যবাদীতার সাথে ও তাদের অনুসরণ করে অতিবাহিত করব। আল্লাহ্ বলেন :

'হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথী ও তাদের অনুসারী হয়ে যাও' (সূরা : তাওবাহ্ আয়াত নং ১১৯)।

এ বিষয়ের গু এত অপরিসীম যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন :

‘হে রাসূল! তুমি এরূপ প্রার্থনা কর! হে আমার প্রভু! আমাকে (সব কাজে) সত্যতা সহকারে উপনীত কর এবং সত্যতার সাথে বের করে নাও’ (সূরা : ইসরা, আয়াত নং ৮০)।

এ জন্যেই ইমাম জা' ফর সাদিক (আঃ) বলেন :

‘অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ কোন নবীকেই প্রেরণ করেননি কিন্তু সত্য ও সত্যতার সাথে এবং আমানত যথাস্থানে পরিশোধ করার জন্য (সে আমানত) পাপী লোকের হোক অথবা পূর্ণবান লোকের হোক’ (বিহা ল আনোয়ার ৬৮তম খঃ, পৃঃ নং ২ ও অনুরূপ ২য় খঃ, পৃঃ নং ১০৪)।

আমরাও আমাদের এ পুস্তকটি রচনার ক্ষেত্রে উল্লেখিত আয়াতসমূহ ও হাদীসের আলোকে চিন্তা-ভাবনা করতঃ আমাদের চেষ্টা- সাধনা ছিল যে, সমস্ত আলোচ্য বিষয়েই যেন সত্য ও সত্যতার সন্ধান করি এবং সত্য ও আমানতের খেলাফ কোন কথা না বলি। আর মহান আল্লাহর কাছে এ আশাই করব যে, তিনি যেন এর উপর স্থায়ী থাকার তৌফিক দান করেন : তিনিই তৌফিক দানের মালিক ।

৮০. উপসংহার :

এ বইতে আমরা যা কিছু উপস্থাপন করেছি তা হচ্ছে রাসূলের আহলে বাইত (আঃ) এর অনুসারী ও শিয়া মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাসের নির্যাস- সার কথা। এখানে ইসলামের মৌলিক ও শাখাগত দিকগুলো কোন প্রকার সামান্যতম পরিবর্তন ও বিকৃতি ছাড়াই বর্ণনা করা হয়েছে। এতে দলীল- প্রমাণ ও সনদ- পত্র কোরআনের আয়াত, হাদীস ও বিভিন্ন বি ওলামাদের গ্রন্থাবলী থেকে খুবই সংক্ষেপে ইংগিত করা হয়েছে। যদিও আমাদের আলোচ্য বিষয় সংক্ষিপ্ত ও সার বস্ত পে তুলে ধরার প্রতি লক্ষ্য রেখে সমস্ত দলীল- পত্র ও প্রমাণাদি উপস্থাপন করা সম্ভব ছিল না। আর এ পুস্তকে সংক্ষিপ্তভাবে সারবস্তুর আলোচনা ছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্যও ছিল না। আমাদের বিশ্বাস, এ আলোচনায় নিম্নলিখিত ফলাফলসমূহ ফুটে উঠেছে :

(১) এটি একটি উ ম উৎস- যা অতি সংক্ষেপে হলেও শিয়া মাযহাবের আকীদা- বিশ্বাসের বিষয়গুলোকে পরিস্কারভাবে ও অতি সূ ভাবে বর্ণনা করছে। সমস্ত ইসলামী ফিরকাসমূহ এমনকি অমুসলমানরা এ ছোট্ট বইটি অধ্যয়ন করে এ মাযহাবের অনুসারীদের আকীদা- বিশ্বাস সম্পর্কে সংক্ষেপে অবগত হতে পারবে।

(২) আমাদের বিশ্বাস : এ বইটি "ইতমামে হুজ্জাতে এলাহী" অর্থাৎ আল্লাহর দলীল- প্রমাণ চুড়ান্ত হল, সে সমস্ত লোকদের জন্যে- যারা আমাদের আকীদা- বিশ্বাস সম্পর্কে না জেনে বিচার করে অথবা তা সন্দেহজনক ও স্বার্থা ষী লোকদের কাছ থেকে কিংবা অনির্ভরযোগ্য বই- পুস্তক থেকে গ্রহণ করে।

(৩) আমাদের বিশ্বাস উপরোল্লেখিত আকীদা- বিশ্বাসসমূহ লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমাদের এ মাযহাবের ও অন্য সমস্ত মুসলিম ফিরকাসমূহের মাঝে তফাতের বিষয়গুলো এমন নয় যে, যৌথ স্বার্থের ক্ষেত্রে পরস্পরের সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে। কেননা, সমস্ত ইসলামী মাযহাবসমূহের যৌথ স্বার্থের ক্ষেত্রগুলো প্রচুর আর অভিন্ন, দুশমনরা সবার জন্যে সমান হুমকী স্বরূপ।

(৪) আমাদের বিশ্বাস : ইসলামী মাযহাবসমূহের মাঝে মত- পার্থক্যকে বড় করে তোলার জন্যে তাদের মধ্যে ঝগড়া- লড়াই, যুদ্ধ- বিগ্রহ ও রক্তারক্তির অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করার কাজে অশুভ শক্তির হাত রয়েছে। আর সে ইসলাম বর্তমান যুগে বিশ্বের বিরাট বিরাট কতকগুলো অঞ্চলকে নিজের বরকতপূর্ণ ছায়াতলে স্থান দিয়ে রেখেছে এবং কমিউনিজমের দাফন হয়ে যাওয়ার কারণে, সৃষ্ট খালি স্থান পূরণ করতে পারছে ও প্রতিদিনের নতুন নতুন সমস্যাবলীর সমাধানে সক্ষম হচ্ছে এবং সমাধানের অযোগ্য পুঁজিবাদের বস্তবাদী নীতির জায়গা পূরণ করার একমাত্র মতাদর্শ, সে ইসলামকে দূর্বল করার অথবা ইসলামের অগ্রগতি ও উন্নতির পথ রোধ করে থামিয়ে দিবার জন্যেই এসব পাঁয়তারা। মুসলমানদের উচিৎ নয় তাদের দুশমনদের এ সুযোগ দেয়া যে, তারা তাদের এ হীন চক্রান্তে সফলকাম হোক এবং ইসলামকে জানার ও বুঝার যে মূল্যবান অবকাশ ও সুযোগ বিশ্বে সৃষ্টি হয়েছে তা হাত ছাড়া হোক।

(৫) আমাদের বিশ্বাস : যদি ইসলামী মাযহাবসমূহের ওলামাবৃন্দ একত্রে বসেন এবং একটা সতর্ক পরিবেশে সচ্ছ ও আন্তরিকতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে এবং পক্ষপাতি ও একগুঁয়েমী নীতি পরিহার করে মতপার্থক্যের বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ- আলোচনা ও পর্যালোচনা করেন তাহলে মতপার্থক্যের বিষয়গুলো কমে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। এ কথা বলব না যে, সমস্ত মতবিরোধই উপড়ে ফেলে দেয়া যাবে; বরং এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, অনেকটা হ্রাস পাবে। যেমন অধুনা ইসলামী ইরানের যাহেদান শহরে একদল শিয়া ও সুন্নী ওলামা বেশ কয়েকবার একত্রে বসেছেন এবং মতবিরোধের একটা অংশ নিরসন করেছেন- যার বিস্তারিত বিবরণ এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সংকুলান হবে না।

সব শেষে মহান আল্লাহর দরবারে আকুল আবেদন জানাচ্ছি :

‘হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে ক্ষমা ক ন; আর আমাদের সেই ভাইদেরকেও যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর আমাদের অন্তরে যেন ঈমানদার লোকদের প্রতি ইর্ষার সৃষ্টি না হয়। হে আমাদের প্রভূ! নিশ্চয় আপনি আমাদের প্রতি বড়ই ে হশীল ও পরম ক নাময়’ (সূরা : আল- হাশর, আয়াত নং ১০)।

যে সব বি ওলামা এ পুস্তক সম্পাদনে সহযোগিদা করেছেন তারা হলেন :

১. মুহাম্মদ রেজা আশতিয়ানী ।

২. মুহাম্মদ জাফার ইমামী ।

৩. আব্দুর রাসূল হাসানী ।

৪. সাইয়্যেদ শামসুদ্দীন হানী ।

৫. মুহাম্মদ আসাদী ।

৬. হোসাইন তুসী ।

সূচিপত্র

এই বইয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : 3

খোদা পরিচিতি ও একত্ববাদ 7

আল্লাহর সত্তা অনন্ত-অসীম : 10

নবীগণের মু' জিযাহ্ আল্লাহর অনুমতিক্রমে : 19

নবী আল্লাহর বার্তা বাহক 24

নবীগণ আজীবন মা'সুম (নিষ্পাপ) : 27

মু' জিযাহ্ ও ইলম-ই-গায়েব : 29

তাওয়াস্সুল বা উছিলা গ্রহণ : 32

কোরআন ও আসমানী কিতাবসমূহ 38

কোরআন বিকৃত হয়নি : 41

কোরআনের তফসিরের বিধান : 47

কিয়ামত ও পূনর্জীবন 53

কিয়ামত ও আমলনামা : 58

বারযাখের জগৎ : 63

ইমামতের তাৎপর্য : 68

বিবিধ বিষয় 82

আল্লাহর আদল্ বা ন্যায়পরায়নতা : 84

ইজতিহাদের দরজা সব সময় উন্মুক্ত : 91

দুই ওয়াক্তের নামায এক সাথে পড়া :. 97

নবী-রাসূল ও ইমামগণের কবর যিয়ারাত : 100

অস্থায়ী বিবাহ্ : 106

শিয়া মাযহাবের সংক্ষি ইতিহাস : 110

উপসংহার : 120